দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ৬ নভেম্বর, ২০২৩।। ১৯ কার্তিক - ১৪৩০
যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১৯ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৬ নভেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

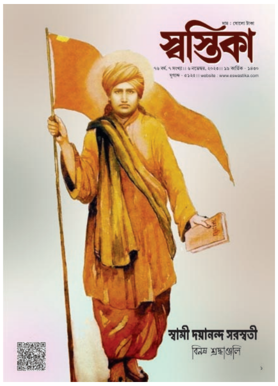

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মহুয়া ভারতীয় সংস্কৃতির কলঙ্ক, মমতা দুষ্ট গোরু আর শূন্য গোয়াল ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদিরও কিন্তু দশ হাত ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

মণ্ডল কমিশনের ত্রুটি সমূহের একটি পর্যালোচনা ◻ ডি. শ্যামবাবু ◻ ৮

চরম আশঙ্কায় পূজা কাটালেন বাংলাদেশের হিন্দুরা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

ভারত নামটিতে এদেশের অন্তরের ছবি আঁকা রয়েছে ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

সঠিক পরিকল্পনা রাঢ়বঙ্গকে জাপান বানাতে পারে ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৪

'চীন অধিকৃত কাশ্মীর'-এর বিস্মৃত কাহিনি ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১৭

ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজ সংস্কারে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ◻ নিতাই নাগ ◻ ২৩

সনাতন ভারতের নবোত্থানের দিশারি— স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ২৫

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও বঙ্গীয় চিন্তন ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৭

সমৃদ্ধির দেবী কোজাগরি লক্ষ্মী ◻ প্রদীপ আচার্য্য ◻ ৩১

বিস্মৃতির অতলে রাজা হরিপাল ◻ মানস বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৩৩

ভারতের উত্থানের উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বকল্যাণ : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ◻ ৩৫

হিন্দুধর্মের বলিষ্ঠ সংস্কারক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ◻ রবিরঞ্জন সেন ◻ ৪৩

বিশ্বশান্তির স্বার্থেই জেহাদি হামাসকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে ◻ মন্দার গোস্বামী ◻ ৪৫

কামদুনির রায় বুঝিয়ে দিল দুধেল অপরাধীরাই এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৭

ধর্ম ও দেশ রক্ষায় শাস্ত্র ও শস্ত্র : প্রসঙ্গ ইজরায়েল ◻ সুশান্ত মজুমদার ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ অন্যরকম : ৪৯ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি-শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

— সম্পাদক, স্বস্তিকা

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৩ নভেম্বর, ২০২৩

প্রকাশিত হবে ১৩ নভেম্বর, ২০২৩

আগামী সংখ্যা দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা

শক্তি সাধনার পীঠস্থান বঙ্গভূমি। মা দুর্গা ও মা কালীর পূজায় বাঙ্গালি বরাবর অগ্রণী। মা দুর্গার মতো মা কালীকেও বাঙ্গালি নানাভাবে আরাধনা করেছে। বঙ্গভূমিতে একাধিক শক্তিপীঠ এবং কালীমন্দির ছড়িয়ে রয়েছে। বঙ্গভূমির সাধকরা শক্তিসাধনার বঙ্গভূমিকে সিঞ্চিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যেও নানাভাবে শক্তি সাধনার উল্লেখ রয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, শেখর সেনগুপ্ত, গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

বীর প্রসবিনী ভারতজননী। এই ভূমিতে কর্মবীর, ধর্মবীর, সমাজবীর, শিক্ষাবীর কত না বীরের আবির্ভাব হইয়াছে। এই পবিত্র ভূমির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখনই আবিলতা আসিয়া কলুষিত করিয়াছে, তখনই এই ভূমির বীর সন্তানগণ ভারতভূমিকে কলুষমুক্ত করিয়া রাষ্ট্রজীবনের প্রবহমানতা বজায় রখিয়াছেন। তাই ভারতবাসীর নিকট এই বীর সন্তানরা আদর্শপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের তিরোধানের পরও তাঁহাদের সেই আদর্শকে এই ভূমির সন্তানরা বহন করিয়া চলিয়াছেন। ভারতবর্ষের জীবনকে সনাতন জীবনদর্শন বলা হইয়া থাকে। এই জীবনদর্শন চির পুরাতন কিন্তু নিত্যনূতন। এই ভূমির বীর সন্তানরা কালে কালে এই দর্শনকে কালোপযোগী করিয়াছেন। এই রকমই একজন ভারত সন্তান হইলেন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী। তাঁহার আবির্ভাব উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নব জীবনের সঞ্চার করিয়াছিল। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনিই প্রেরণাপুরুষ ছিলেন। তিনিই ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ভারতবর্ষ শুধুমাত্র ভারতীয়দের জন্য, বিদেশিদের এই দেশ শাসন করিবার কোনোপ্রকার অধিকার নাই। তাঁহার প্রেরণায় দেশীয় রাজন্যবর্গ, ব্রিটিশ ভারতীয় সৈনিক হইতে শুরু করিয়া সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতব্যাপী এই গর্জনা ব্রিটিশ শাসকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামেও গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব প্রদেশের বিপ্লবীরা তাঁহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। লোকমান্য তিলকও পরবর্তীকালে স্বরাজের মন্ত্র তাঁহার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। দয়ানন্দজী জাতপাত ও অপৃশ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষীয় সমাজ একই পরমাত্মার প্রকাশ, সকলেই সেই পরমাত্মার অংশ, তাই সকলেই সমান। জাতপাতের শৃঙ্খল তিনি ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। সামাজিক অবাঞ্ছিত কুরীতি, কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। মহিলা শিক্ষা ও বেদভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি অ্যাংলো বৈদিক শিক্ষা সংস্থান ও গুরুকুল স্থাপন করিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহেরও তিনি প্রবল সমর্থক ছিলেন। নারী-পুরুষ সমানতা, সামাজিক সমানতা, সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার, গোরক্ষা ও গোপালন, যোগ ও প্রাণায়ামের প্রচার ও প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কালজয়ী অবদান হইল শুদ্ধি আন্দোলন। ইসলাম ও খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিতদের তিনি পুনরায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই শুদ্ধি আন্দোলন এত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল যে তাঁহার শিষ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে বিধর্মীদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। মহর্ষি দয়ানন্দ রাষ্ট্রজীবনের পুনরুত্থানের জন্য যে আন্দোলন সংগঠিত করিয়াছিলেন আজও তাহা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচি পালন করিতেছে। এই বৎসর গত মার্চ মাসে পানিপথে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে বিভিন্ন কর্মসূচি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। মহর্ষির গোরক্ষা আন্দোলন, গোহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন, গোনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার পুনস্থাপন, গোপালনে সমাজ জাগরণ, নেশামুক্ত সমাজ গঠন, অস্পৃশ্যতা দুরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আজও সমাজে জাগরণ আবশ্যক। মহর্ষি দয়ানন্দজীর ন্যায় সঙ্ঘও মনে করে স্বদেশি, স্বভাষা ও স্ব-বোধ ব্যতীত সত্যকারের স্বরাজ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতীয় মহাপুরুষদের বর্ণিত পথেই ভারতের পুনরুত্থানের কার্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্বস্তিকার বর্তমান সংখ্যাটি মহর্ষির প্রতি এক বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুভাষিতম্

অকৃত্যং নৈব কর্তব্যং প্রাণত্যাগেহপি সংস্থিতে।
ন চ কৃত্যং পরিত্যাগং ধর্ম এষ সনাতনঃ।।

প্রাণসংকট উপস্থিত হলেও গর্হিত কর্ম করা উচিত নয় এবং সৎ কর্ম থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। এটাই শাশ্বত ধর্ম।

মহুয়া ভারতীয় সংস্কৃতির কলঙ্ক

মমতার দুষ্ট গোরু আর শূন্য গোয়াল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মুখে মধু পেটে বিষ। বঙ্গীয় শব্দকোষ আরেক বাংলা ভাষার অভিধান বলছে মহুয়া শব্দের অর্থ যাতে শুধুই মধু রয়েছে। অনেকের দাবি ৪৯ বছরের 'শিশু' সাংসদ (২০১৯ তিনি প্রথম সাংসদ হন) তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রের জন্য সে নিয়ম খাটে না। তাঁর নাকি মুখে মধু, পেটে বিষ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সংসদীয় বিশ্বাসযোগ্যতা আর পবিত্রতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি শিল্পপতিদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করেন। আইনের মন্দির (সংসদ)-কে কলুষিত করতে পিছপা হন না। সবাই জানেন, মহুয়া উদ্ভটরকমভাবে কিছু না জেনেও ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। তার অনেক উদাহরণ রয়েছে তাই ভুল প্রমাণ করা কঠিন।

মহুয়ার পুরোনো হিরো রাহুল গান্ধীও অনৈতিহাসিক কথা বলায় পারদর্শী। হয়তো আগামীদিনে তিনি তার নতুন গুরু হতে পারেন। নির্বুদ্ধিতার জোরে রাহুল ঘরে অনেক শত্রু বানিয়েছেন। গান্ধীজীর হত্যা নিয়ে তাঁর বক্তব্য নির্বুদ্ধিতার বড়ো প্রমাণ। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য শিশু-প্রচেষ্টা। মহুয়াও তাই। রাহুল আর মমতার সঙ্গে মহুয়ার অনেক মিল আর ফারাক সামান্যই। তার একটা সুবিধা আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে তিনজনের অপরিসীম স্বল্পবিদ্যা। এর অনেকটা মূর্খামি। ফলে কোনো দায়িত্ব নিতে হয় না। অজ্ঞানতায় মাতাল ব্যক্তি সদৃশ। এ বিষয় রাজ্যপাটে আগেই লেখা হয়েছে (২২.০৭.২০২৩)। মহুয়া আর মমতা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভুল আর মিথ্যা বলেন আর সমান আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তা অস্বীকার করেন।

তবে মমতার ভুল অনেকটাই ইচ্ছাকৃত, মিথ্যা রাজনৈতিক আর পারিবারিক স্বার্থে মেশানো। মহুয়ার কেবল ব্যক্তিস্বার্থ। তাতে জাতীয় স্বার্থ চুলোয় গেলেও তিনি তুরীয় থাকেন। দু'জনেরই দুই নীতি। সামনে জননীতি আর গোপনে সুবিধানীতি। মেঠো ভাষায় যাকে বলে মধ্যস্থতা আর দালালি। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সংসদীয় রাজনীতিকে ঢাল করে তিনি এক শিল্পপতির দালালি করেছেন অন্য এক শিল্পপতিকে কাদায় ফেলতে। দালালির উৎকোচ বাবদ উপহারও বাগিয়েছেন। মজার ব্যাপার, নেত্রী মমতা কিন্তু মহুয়ার ওই কপট শিল্পপতিকে জামাই আদর করে রাজ্যে ডেকে নিয়ে এসেছেন কয়লা আর বন্দর শিল্পে অনেক হাজার কোটি টাকা লগ্নির জন্য।

আশির দশকে এক পাকিস্তানি গায়িকার চটুল হিন্দি গানের ঠাট্টা করে নামজাদা এক বাঙ্গালি সাহিত্যিক লিখেছিলেন এ যুগের গায়করা নিজেরাই গান করেন আর সুর মিলিয়ে 'আহা আহা' বলেন। এখন গায়করাই শ্রোতাদের জায়গা নিয়েছেন। মহুয়ার সঙ্গে ওই পাকিস্তানি গায়িকার মিল রয়েছে। অন্যের ধার করা বুলি নিয়ে মনগড়া তত্ত্ব আর ধারণা তৈরি করেন মহুয়া আর তারপর আহা আহা করেন। আর সেই থেকেই তার ঢাক বাজছে। এবার জুড়ে গিয়েছে তাঁর ৬১টির মধ্যে ৫০টি দালালির প্রশ্ন। মহুয়ার মুখোশ খসে পড়েছে। লক্ষণীয়, সস্তা ইংরেজি জানা কিছু দেশবিরোধী অভিজাত লোক মহুয়াকে বাহবা দিলেও মমতা কিন্তু মহুয়াকে কোনো গুরুত্ব দেন না।

> **মমতার কাছে মহুয়া দুধেল গাই নয়। দুষ্ট গোরু। মমতার মতো চতুর নেতার গোয়ালে মহুয়ার ঠাঁই পাওয়া কঠিন। ৩৭ বছরের 'টিম অভিষেক'-এ ৪৯ বছরের মহুয়ার জায়গা হবে না।**

আবার আবোল তাবোল বকার জন্য দল থেকে বহিষ্কারও করে না। কারণটা খুব অজানা নয়। মা কালী নিয়ে মহুয়ার উৎকট ভাবনার সমালোচনা আর ধিক্কার জানাতে মমতা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত মহাভারতকার আর পুরাণকার নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়িকেও খোলা ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। রাজ্য রাজনীতিতে মহুয়া বেমানান। তাই প্রশ্ন উঠছে, ২০২৪-এর জাতীয় ভোটে তিনি থাকবেন না উবে যাবেন। আর তা হলে মানতেই হবে রাজনৈতিকভাবে মমতা আর মহুয়া আলাদা। মমতার কাছে মহুয়া দুধেল গাই নয়। দুষ্ট গোরু। মমতার মতো চতুর নেতার গোয়ালে মহুয়ার ঠাঁই পাওয়া কঠিন। ৩৭ বছরের 'টিম অভিষেক'-এ ৪৯ বছরের মহুয়ার জায়গা হবে না। মহুয়ার হাঁটুর বয়সি রাজন্যা, সায়নী আর কৌশানিরা সেখানে ঢুকে রয়েছে। মহুয়া তাই ব্রাত্য। এই মুহূর্তে মমতার কাছে শূন্য গোয়াল ভালো। তবে এরপর মহুয়ার কোনো গোয়ালে (রাজনৈতিক দলে) ঠাঁই হবে সেটাই দেখার। রাজনীতি অসম্ভবের খেলা। সেখানে সব সম্ভব। □

দিদিরও কিন্তু দশ হাত

গৃহবন্দিনী দিদি,

শুভ বিজয়া। কাছে গিয়ে প্রণাম তো করা যাবে না। যা শুনলাম আপনি এবার কারও ছোঁয়াই নেননি। তাই বিজয়ার শুভেচ্ছা জানালাম।

সেই কবে থেকে আপনি বন্দি। স্পেন, দুবাই সফর করে ফিরে এসে আর বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারেননি। পূজার উদ্বোধন করেছেন মোবাইল দিয়ে। প্রতিমার চক্ষুদানের বিশ্ব রেকর্ডও করেছেন। এর আগে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই চরাচরে কেউ মা দুর্গার চক্ষুদান করেছেন বলে মনে হয় না। কোনও মণ্ডপেই যাওয়া হয়নি। আপনি বলেছেন পায়ে ব্যথা। কবে যে লাগল! ২০২১ সালে ভোটের সময়ে 'ভাঙা' পা নিয়ে গোটা রাজ্য ঘুরেছেন। তার পরে হেলিকপ্টার থেকে নামতে গিয়ে মাস কয়েক আগেই ফের চোট। হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে বিদেশেও ঘুরে এলেন। তার পরে কী হলো দিদি? আপনি ঠাকুর দেখতেও বের হলেন না! চিন্তা হয়! তবে আপনার সরকারি আয়োজনে কলকাতার 'সেরা' ঠাকুররা আপনাকে 'দর্শন' দিয়ে এসেছেন। কার্নিভালের দিন আপনি দেখলাম মঞ্চে উঠেছেন। কিন্তু দিদি, নবান্নে কবে নিয়মিত আসবেন? কবে আবার রাজনীতির মঞ্চে?

জানি দিদি, মন ভালো নেই। শরীরের থেকেও উদ্বেগ মন নিয়ে। ভাইপো, ভাইপো বউকে নিয়ে চিন্তা করা আপনি ছেড়ে দিয়েছেন জানি। কিন্তু এখন ভাই, ভায়ের বউকে নিয়ে যে বড়ো চিন্তা। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সংস্থার মাথায় তো তাঁরাই। শুনলাম তো কেউ যাতে কিছু করতে না পারে তাই জন্য নিজের বাড়িতে শ্রীযুক্ত অমিত এবং শ্রীমতী লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগলে রেখেছেন। আপনি কি তবে নিজেও ওঁদের পাহারা দিচ্ছেন?

দিন দিদি দিন। সময় ভালো যাচ্ছে না। দুর্নীতিতে যাঁরা জড়িত তাঁদের কান ধরে টান পড়েছে। মোদী সরকারটা বড্ডই একগুঁয়ে। ওই যে বলেছিলেন, খাবও না, খেতেও দেব না। আপনিই দেখুন লোকটা প্রায় দশ বছর সরকার চালিয়ে ফেলল কোনও খাওয়ার অভিযোগ নেই। আর আপনার অবস্থাটা ভাবুন। পার্থ, কেষ্ট, মানিক জেলে। ঢুকে গেল বালুটাও। বাকিবুর, কুন্তল, শান্তনুদের কথা আর বললাম না। শিক্ষা দপ্তরের আরও সব কর্তাদের কথাও বাদ দিচ্ছি। মহুয়া তো আবার বিশাল কেলেঙ্কারি করে ফেলেছে। চুরি নয়, দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। কী করবেন আর আপনি!

তবে আমি জানি দিদি যে মা দুর্গার মতো আপনারও দশ হাত। আজ যাঁরা জেলে এবং আগামীতে যাঁরা জেলে যাবেন সবার মাথায় আপনার সেই দশ হাত ছিল। শুনছি যাঁরা জেলে রয়েছেন বা জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা বলছেন দিদির হাত সব দুর্নীতিতেও ছিল। মানে দিদির পরামর্শেই সব হয়েছে। এটা অবশ্য আপনিও মানেন যে তৃণমূলে কোনও কিছুই আপনার অনুমতি ছাড়া হয় না। কে থাকবে, কে যাবে, কে উঠবে, কে নামবে সব আপনি ঠিক করেন। আপনিই আগে থেকে বলে দেন কারা জেলে যেতে পারে। যেমন বালুর ক্ষেত্রে বলে দিয়েছিলেন। আবার দু-তিনটে নামও আপনি করে রেখেছেন। চিন্তা নয়, আমি নিশ্চিন্ত যে আপনার কথা মিলে যাবে। কিন্তু দিদি, একে একে সবাই ঢুকে গেলে ভাইফোঁটা কাতে দেবেন?

বিজেপি থেকে ভাঙিয়ে যে ভাইগুলোকে নিয়েছিলেন সেগুলোকে তো আপনি দূরে দূরেই রাখেন। তাঁরাও সেয়ানা। গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব করতে গিয়ে খাতায়-কলমে বিজেপি হয়েও তাঁরা নাকি তৃণমূলে। সামনে এসে বলার হিম্মত কারও নেই। তা হলে আবার বিধানসভার স্পিকার বকা দেবেন। এদিকে মুকুল রায়ের দশা দেখে পরবর্তীকালে যাওয়া 'গদ্দার' ভাইয়েরা নাকি ভয়ে ভয়ে আছেন। কেউই তো কিছু পাননি। না ঘরকা, না ঘাটকা হয়ে বিধানসভায় যান, আসেন। মুকুলদাদা তো সে পাটও চুকিয়ে দিয়েছেন।

দিদি, একটা কথা মনে করিয়ে দিই। বালু খুব চুরি করছে বলে আপনি ওঁকে খাদ্য থেকে সরিয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন। মানে বন দপ্তরে। দিদি, আপনার মনে আছে বনের দায়িত্বে থাকা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিজেপিতে তখন আপনি বলেছিলেন, বনে অনেক দুর্নীতি করেছে রাজীব। ভোটের পরে তদন্ত হবে। কিন্তু এখন তো শোনা যায় রাজীব তৃণমূলেই আছেন। কোথাও দেখা অবশ্য যায় না। বলছি, বন দপ্তরের সেই বকেয়া তদন্ত তো আপনি করলেন না। ওটাও কি কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতেই যাবে।

আপনাকে নিয়ে উদ্বেগের আরও একটা কারণ রয়েছে। শুনেছি সেই চিন্তাটাই আপনাকে বেশি করে গৃহবন্দি করে রেখেছে। দলে আপনার তালুক নাকি ভাইপো দখল করে নিয়েছে। সরকারটা নিতেও চাপ দিচ্ছে। এই তো ক'দিন আগেই দেখলাম ভাইপোকে নিয়ে যাঁরা অতীতে প্রকাশ্যে সরব ছিলেন সেই মহুয়া, শতাব্দী, কল্যাণ, ববিরা ভাইপোর পায়ের কাছে বসে পড়েছেন।

সত্যিই চিন্তা হচ্ছে। আপনি ভাইফোঁটা কাকে দেবেন বলুন তো! দশ হাতে দল, সরকার, দুর্নীতিতে মদত, বিরোধীদের শায়েস্তা সব সামলেছেন। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বাঁ হাতের কড়ে আঙুল কপালে ছোঁয়ানোর লোক কই!

ভাইপোটার জ্বালায় ভাইফোঁটাই অনিশ্চিত। ▯

অতিথি কলম

ডি. শ্যাম বাবু

মণ্ডল কমিশনের ত্রুটিসমূহের একটি পর্যালোচনা

জাতিভিত্তিক জনগণনা বা জনসমীক্ষা ভারতের জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে অপারগ। কিন্তু এই সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতাও দেশের অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক।

বিহারের রাজ্য সরকার প্রকাশিত 'জাতিগত সমীক্ষা'-র তথ্য আগামীদিনে রাজনৈতিকভাবে অস্থির ভারতীয় সমাজ জগতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করতে চলেছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক অস্থিরতা অপেক্ষমান।

এই সমীক্ষার দরুন দশবার্ষিক জনগণনার মধ্যে জাতিভিত্তিক গণনার অন্তর্ভুক্তির দাবি ছাড়াও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশের সর্বোচ্চ সীমার বৃদ্ধি এবং সদ্য পেশ হওয়া বিচারপতি রোহিণী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবিসমূহ জোরালো হবে। রোহিণী কমিশনের রিপোর্টে ২৬০০টি জাতি সংবলিত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বা আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (ওবিসি) সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় তালিকায় সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির উপশ্রেণীবিন্যাসের বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়েছে।

জাতিগত জনসমীক্ষাকেন্দ্রিক এই কার্যকলাপের আলোচনা আজ একটি চর্চার বিষয়। কারণ জাতিতত্ত্বের এই ভূতটি বহু দিন যাবৎ বোতলমুক্ত। তাই জাতিগণনার এই বিষ সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করবে — এ জাতীয় চিন্তাধারা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয় না। এমনকী, শতাধিক জাতিকে সংরক্ষণ সীমার অন্তর্গত করার প্রক্রিয়া একটি প্রশাসনিক দুঃস্বপ্নের উদ্রেক করবে — এহেন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও জাতিগত সংরক্ষণের সীমা বৃদ্ধির দাবিকে ম্লান করতে অপারগ।

এই ব্যাপারে জাতপাতের রাজনীতির বিষয়টা প্রধান হয়ে ওঠে। বিহারের এই জাতিগত সমীক্ষার পরিচালক, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই সমীক্ষার দ্বারা ভোটের অঙ্কে লাভবান হতে পারেন। নীতীশ কুমার অন্যতম একজন যিনি সিকি শতাব্দী আগে ভারতের রাজনৈতিক পরিসরকে মণ্ডল-কমণ্ডলুর মেরুকরণের এক পটভূমিতে পরিণত করেছিলেন। এই উত্তাপের আবহে নিজেদের রাজনৈতিক রুটি সেঁকতে এই নেতারা সিদ্ধহস্ত।

এই ধরনের নেতাদের কার্যকলাপে, মণ্ডল কমিশনের মাধ্যমে সংরক্ষণের সুবিধাপ্রাপ্ত, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ওবিসি সম্প্রদায় এবং ধর্মের ব্যবহার করে সমাজে স্থায়ী আধিপত্য ও প্রভাব রক্ষাকারী অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু উচ্চবর্ণের বিভেদ আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সমাজের মধ্যে একটি নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর সৃষ্টি এবং নিপীড়ক সংখ্যালঘুদের সঙ্গে তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নীতীশকে নির্বাচনী ফায়দা এনে দিয়েছে। যদিও ব্যালে নর্তকের অভাবনীয় দক্ষতায় তিনি মণ্ডল-কমণ্ডলুতে অবাধ, অনায়াস বিচরণ ও বারবার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। এটা ভাবার বিষয় যে অদূর ভবিষ্যতে তিনি হয়তো পুনরায় শিবির বদলে বিজেপির হাত ধরে কমণ্ডলুকে আলিঙ্গন করতে পারেন।

২০১৪ পরবর্তী পর্যায়ে, বিজেপি হিন্দু ঐক্য বিধানে গুরুত্ব আরোপ করে মণ্ডল-কমণ্ডলুর বিভাজন রেখাকে প্রায় মুছে ফেলেছে। বিজেপির নির্বাচনী সাফল্যের সিংহভাগ অংশের পেছনে ক্রিয়াশীল অতি পিছড়ে বর্গ বা মহাদলিত সম্প্রদায় (মোস্ট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস / এমবিসি)-এর অকুণ্ঠ সমর্থন। এই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবিসমূহকে পুঁজি করে রাজনৈতিক সাফল্য লাভের পর আজকের এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় শাসকদল কতটা সাড়া দেয় সেটাও দেখার।

মহাদলিত ভোট ব্যাংক রক্ষায় তোষণ নীতি গ্রহণ করে বিজেপিও জাতিগত জনগণনাকে সমর্থন এবং তার ভিত্তিতে সংরক্ষণ সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলে, তাদের উচ্চবর্ণের সমর্থন হারানোর সম্ভাবনা প্রবল হবে। বর্তমানে বিজেপির তরফে জাতিগত জনসমীক্ষা ও সংরক্ষণের সীমা বৃদ্ধির বিরোধাভাস সঠিক প্রশাসনিক ভিত্তির ওপরে স্থাপিত হলেও, পরিণামে মহাদলিত সম্প্রদায়ের সমর্থন হারানোর ঝুঁকি থেকে যায়।

কিন্তু এখন এটা আর নিছক রাজনৈতিক বিষয় নয়। বিহারের এই জাতিগত সমীক্ষার সংখ্যাগত ফলাফল চোখ কপালে তোলার মতো! ৮৪.৪৬ শতাংশের বিরাট জনগোষ্ঠী এই সমীক্ষা অনুযায়ী ওবিসি, এমবিসি, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত, যেখানে উচ্চবর্ণের সংখ্যা মাত্র ১৫.৫৪ শতাংশ। এখানে ১৭.৭০ শতাংশের সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী ওবিসি / এমবিসি শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। যদি এই সংখ্যাগুলি ১০ শতাংশ ত্রুটিরেখাযুক্ত হয়েও জাতীয় প্রেক্ষাপটের একটি নমুনা রূপে বিবেচিত হয়, তবে এর তিনটি তাৎপর্য সুস্পষ্ট।

(১) যে গোষ্ঠীসমূহ মোট জনসংখ্যার

এক-চতুর্থাংশেরও কম, তারা উচ্চশিক্ষায় ও চাকরিতে তিন-চতুর্থাংশ আসনের অধিকারী।

(২) কে কী ধরনের কর্মসংস্থান অর্জন করার যোগ্য বা কারা কোন্ স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে — এসবের মতো সমাজ জীবনের প্রতিফলনসমূহ জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের এই ক্রমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। উচ্চবর্ণের লোকজন অনগ্রসর জাতিভুক্ত মানুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন যাপন করে থাকেন। এটা কী জাতিভেদের ফলাফল নাকি শ্রেণীবৈষম্যের পরিণাম?

(৩) জাতিগত বৈষম্যের নিরসনের লক্ষ্যে এই বৈষম্যের চরিত্রকে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য এক প্রকারের জনগণনার প্রয়োজনীয়তা।

যদিও, জাতিভিত্তিক জনগণনাকে প্রশাসনিকভাবে দুরূহ ও অসুবিধাজনক বলে জানিয়ে কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে সঠিক বক্তব্য তুলে ধরেছে। ২০২১ সালে সর্বোচ্চ আদালতে কেন্দ্রের পেশ করা হলফনামায় ১৯৫১ সাল থেকে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতিভেদকে কোনো ভাবে প্রাধান্য না দিয়ে সচেতনভাবে জাতিবৈষম্যকে মুছে ফেলার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু তার পরের সাতটি দশক জাতপাতের বিভাজনের রাজনীতির সাক্ষী থেকেছে।

মণ্ডল কমিশনের একমাত্র তপশিলি জাতিগোষ্ঠীভুক্ত প্রতিনিধি সদস্য আরএল নায়েক পোষিত ভিন্নমতের ওপর ১৯৯০ পরবর্তী অধ্যায়ে কোনো সরকার যদি গুরুত্ব আরোপ করতো তাহলে দেশ জুড়ে এই ব্যাপক বিকর্কের উদ্রেক হয়তো হতো না। জমিজমার মালিক, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল শ্রেণী এবং দরিদ্র, ভূমিহীন, শিল্পী-কারিগর শ্রেণীতে ওবিসি সম্প্রদায়কে বিভক্ত করার বিষয়ে তিনি প্রস্তাব দেন। ওবিসি সংরক্ষণ সীমার এই যুক্তিসঙ্গত বিভাজন সম্ভব না হলে ভূমিহীন, দরিদ্র শ্রেণীর (যা আজ এমবিসি নামে পরিচিত) ওপর তা এক বিরূপ প্রভাব ফেলবে — আরএল নায়েকের এই আশঙ্কা আজ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। তার সুচিন্তিত পরামর্শ উপেক্ষা করার দেশব্যাপী পরিণাম আজ স্পষ্ট। জাতিভিত্তিক সমীক্ষা যে সমস্যাগুলির জন্ম দেয় তার মধ্যে অন্যতম সমস্যাটি হলো — একটি সর্বজনীন ওবিসি সংরক্ষণ নীতি অতি পিছড়ে বর্গ বা সর্বাধিক অনগ্রসর শ্রেণীর (এমবিসি-র) জন্য কোনো ন্যায্য বন্দোবস্ত নয়। সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারে গণনা আবশ্যক হলেও, যদি এর পরিণামে সংরক্ষণের সীমা বৃদ্ধি সরকারি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রস্তাবিত বিষয় হয়ে ওঠে, তাহলে সামাজিক অসাম্যের জটিল সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

তাই জাতিভিত্তিক জনগণনা বা জনসমীক্ষা ভারতের জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে অপারগ। কিন্তু এই সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতাও দেশের অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক। সব সামাজিক বাস্তবতা সবসময়ে তথ্য ও পরিসংখ্যান নির্ভর না হলেও, সেই বাস্তবতা সম্পর্কে জনসমাজের উপলব্ধি অপরিণত হলেও শেষ পর্যন্ত সেই উপলব্ধিটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশ জুড়ে ওবিসি সম্প্রদায়ের সিংহভাগ মনে করে তারা বৈষম্যের শিকার, তাদের কথা শোনা হচ্ছে না। তাদের দৃঢ় ধারণা যে একমাত্র সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমাই তাদের উন্নয়নে সক্ষম। এখন মূল প্রশ্ন হলো:

আজ অব্দি প্রণীত ও প্রবর্তিত প্রতিকারসমূহ কী এই সমস্যার চেয়েও খারাপ?

হয়তো তাই!

দেশ যদি মুখ ঘুরিয়ে থাকে তবে কী এই সমস্যার নিরসন সম্ভব?

কখনোই নয়।

(লেখক সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের সিনিয়র ফেলো)

শোকসংবাদ

মেদিনীপুর শহরের মাতৃসমা বউদি মানসী কবি গত ৫ অক্টোবর বেশ কয়েকদিন রোগভোগের পর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্বামী মনোরঞ্জন কবি মেদিনীপুর শহরের একেবারে প্রথম স্বয়ংসেবকদের মধ্যে একজন (১৯৫৬)। বউদিও সমস্ত স্বয়ংসেবক ও প্রচারকদের খুবই স্নেহ করতেন। আদর করে বাড়িতে ডেকে খাওয়াতেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। সঙ্ঘের ভালো-মন্দ খবর শুনলে আনন্দ ও দুঃখ অনুভব করতেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্বামী, ২ পুত্র, ১ কন্যা, পুত্রবধূ, ২ নাতনি, ১ ভাই, ১ বোন ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রচার প্রমুখ সুশোভন মুখার্জির মাতৃদেবী সুনীতিদেবী গত ১৩ সেপ্টেম্বর বহরমপুরের বাড়িতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা মধ্যভাগের বীরেশ্বর শাখার স্বয়ংসেবক তথা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দাশরথী নন্দী গত ১৪ অক্টোবর দূরদর্শনে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে বালি হাওড়ার বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

* * *

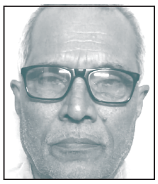

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রিপুরা প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ, হুগলী জেলার চুঁচুড়ার সুকান্তনগরের স্বয়ংসেবক, সঙ্ঘের প্রচারক অশোক বিশ্বাসের পিতৃদেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস গত ১৫ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন।

চরম আশঙ্কায় পূজা কাটালেন বাংলাদেশের হিন্দুরা

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে অশান্তির আশঙ্কা ছিলই। তবে গত দু'বছরের মতো সর্বাত্মক বড়ো ধরনের কোনো হামলার ঘটনা না ঘটলেও এবারে বাংলাদেশে পূজা একেবারে নির্বিঘ্নে উতরে গিয়েছে তা বলা যাবে না। সপ্তমীর দিন ঢাকা শহরের দুর্গামন্দিরে দুষ্কৃতীরা নিষিদ্ধ মাংস ছুঁড়ে অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করলেও বাংলাদেশ প্রশাসন সতর্ক থাকায় বড়ো ধরনের ঝামেলা এড়ানো গিয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশ পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বাংলাদেশে এবারের দুর্গাপূজায় নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে সনাতনীদের ওপর হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। কারণ গুজব ছড়িয়ে সেদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অতীত উদাহরণ রয়েছে। বিশেষ করে, এবার পূজার দুই মাস পরেই জাতীয় নির্বাচন, তাই আশঙ্কাও বেশি ছিল। তবে দেশের মুখ বাঁচাতে সক্রিয় ছিল বাংলাদেশের পুলিশ-প্রশাসন। তাই পূজার সময় রাজনৈতিক দলগুলিকে কোনো কর্মসূচি রাখতে দেওয়া হয়নি। পূজা যাতে উৎসবমুখর পরিবেশে হয় তাই এই সময়ে ঘটমান সরকারবিরোধী আন্দোলনের কোনো কর্মসূচির অনুমতিও দেওয়া হয়নি সেদেশের প্রশাসনের তরফে। ইতিপূর্বে গুজব ছড়িয়ে পূজামণ্ডপে হামলার ঘটনা এখনো তাড়া করে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের। ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নেওয়া হয়েছিল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। পুলিশ সদর দপ্তর থেকেও সবগুলো জেলাতে পাঠানো হয়েছিল সরকারি নির্দেশনা। এছাড়া মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ থেকেও নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন : 'এবার আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির উভয়েই সাম্প্রদায়িক হিংসার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারাই যখন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তাহলে তো আমরা আর আশঙ্কামুক্ত থাকতে পারি না।'

তথ্যভিজ্ঞমহল মনে করছেন, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে আজকের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। সবাই একসঙ্গে নির্বাচন করেছিল। তারপরও সনাতনীদের ওপর হামলা হয়েছিল। ওই সময়ের পরেও তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে। ২০০৯ সালের আগে সেদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় দেশের মদত ছিল। এরপরে যে হামলাগুলো হয়েছে তা রাজনৈতিক দলগুলির মদতপুষ্ট। এবার পরিস্থিতি আরও খারাপ। রাজনৈতিক দলগুলো এতটাই রেশারেশির পর্যায়ে আছে যে সনাতনীদের ওপর হামলার আশংকা বেশি রয়েছে। পূজার আনন্দের সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলার সময় হিসেবে তারা বেছে নিতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছিল। শ্রী দাশগুপ্ত এই প্রেক্ষিতে মনে করেন, সরকার চাইলে হামলা বন্ধ করতে পারে, তারা না চাইলে হামলা হয় না। এবারের দুর্গাপূজা তা ফের প্রমাণ করে দিয়েছে বলে রানা দাশগুপ্তের অভিমত।

এবছর ঢাকা-সহ সারা দেশে ৩২ হাজার ৪০৭টি মণ্ডপ ও মন্দিরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি ছিল। গতবারের তুলনায় এই সংখ্যাটি কিছু বেশি। এর মধ্যে ঢাকায় পূজা হয়েছে ২৪৩টি মণ্ডপে। যা গতবারের থেকে দুটি বেশি। পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতারা এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশের আইজি-সহ সরকারে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করে পূজার সময় সর্বোচ্চ নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছিলেন। তারা নিজেরাও এবার মণ্ডপের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্মল কুমার চ্যাটার্জি বলেন, আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইজিপি, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে পূজা নিয়ে বৈঠক করেছিলাম। সবাই আমাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তা কার্যকরী হয়ে আপাত শান্তিপূর্ণভাবেই শারদীয় দুর্গাপূজা পালিত হয়েছে। ঢাকার বাইরে যদিও ছ'-সাতটি মণ্ডপে প্রতিমা তৈরির সময় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি জে এল ভৌমিক। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত আছে, যারা সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে প্রতিমা ভাঙচুর করার। তবে আপাতভাবে শান্তিপূর্ণভাবে পূজা মেটায় স্বস্তির শ্বাস ফেলছেন সেদেশের হিন্দুরা। □

ভারত নামটিতে এদেশের অন্তরের ছবি আঁকা রয়েছে

সাধন কুমার পাল

সাম্প্রতিককালে ভারত সরকার কয়েকটি জায়গায় ইন্ডিয়া নামের বদলে ভারত নাম ব্যবহার করেছে। যেমন প্রেসিডেন্ট অব ভারত, প্রাইম মিনিস্টার অব ভারত ইত্যাদি। সরকার থেকে কখনোই বলা হয়নি যে দেশের নাম বদল হচ্ছে। ইন্ডিয়া ও ভারত দুটোর মধ্যে যে কোনো নাম যে কোনো সময় ব্যবহার করা সংবিধান সম্মত। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই ভারত নাম নিয়ে I.N.D.I.A. জোটের সদস্যদের এত আপত্তি কেন?

বিগত ১০০ বছরে পৃথিবী জুড়ে অনেক দেশের নামই পরিবর্তন হয়েছে। যার মূলে রয়েছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ। কেউ ভাবমূর্তি পরিবর্তনের জন্য, কেউ আবার সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পরিবর্তন করেছে দেশের নাম। যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার সীমান্তে রয়েছে টার্কি, যা প্রাচ্যে 'তুরস্ক' নামে পরিচিত। সেই দেশের নামও বদলাতে চলেছে। ২০২২ সালের জুনে জাতিসঙ্ঘকে তুরস্ক জানিয়েছে, তাদের যেন এবার থেকে 'তুরকিয়ে' নামে ডাকা হয়।

প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান এক বিবৃতিতে নামবদলের কারণ জানান। তিনি বলেন, তার দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা, মূল্যবোধকে সব থেকে ভালোভাবে প্রকাশ করে নতুন নাম 'তুরকিয়ে'। তাই নতুন এই নামকরণ।

শ্রীলঙ্কা : ব্রিটিশরা ভারতের দক্ষিণে ছোট্ট দেশটির নাম রেখেছিল 'সিলোন'। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। পূর্বতন শাসকদের চিহ্ন মুছে ফেলতে ১৯৭২ সালে দেশটির নাম হয় শ্রীলঙ্কা। ২০১১ সালে সরকারি নথিপত্রেও 'সিলোন' নামটির ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়।

কম্বোডিয়া : নাম ছিল কাম্পুচিয়া। তার ইংরেজি 'অনুকরণ' হলো কম্বোডিয়া। ১৯৭৬ সালে সেই দেশের কমিউনিস্ট শাসকেরা দেশকে কাম্পুচিয়া বলে অভিহিত করতেন। কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হওয়ার পর দেশের নাম বদলে সরকারিভাবে 'কম্বোডিয়া' রাখা হয়।

ইরান : এককালে পারস্য (পার্সিয়া) নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩৫ সালে ক্ষমতায় আসেন রেজা শাহ। তখনই দেশের নাম বদলে 'ইরান' রাখা হয়। তাঁর তরফে জানানো হয়েছিল, দেশে নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। তাই নামবদল। যদিও এখনও এ দেশের খাবার, শিল্প, সাহিত্য 'পারসিক' হিসেবেই পরিচিত।

শহরের নাম পরিবর্তন

এর আগেও ভারতবর্ষের বহু শহর ও স্থানের নাম পরিবর্তন হয়েছে। যেমন মাদ্রাজ হয়েছে চেন্নাই, বোম্বে হয়েছে মুম্বই, ক্যালকাটা হয়েছে কলকাতা। এই সমস্ত পরিবর্তনের পেছনে একটি কারণ যে উপনিবেশিক শাসকরা তাদের উচ্চারণের সুবিধার্থে এদেশের ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতির তোয়াক্কা না করে ভারতীয়দের মনোবল ভেঙে দিতে তাদের মতো করে নাম রেখে দিয়েছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্থান-কাল-পাত্র যাই হোক না কেন যে কোনো নামকরণের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

মুম্বই নামটি আসলে এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বাসিন্দা কোলি মৎস্যজীবী পৃষ্ঠপোষক দেবতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শহরের আসল নাম ছিল 'মুম্বা দেবী'। 'মুম্বা' দেবীর নাম অনুসরণ করে এই শহরের নামকরণ হয় মুম্বই।

শহরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত মুম্বা দেবীকে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটি এখনও স্থানীয়দের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান।

চেন্নাই নামের প্রথম অফিসিয়াল ব্যবহারটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্রান্সিস ডের প্রাপ্ত ২২ আগস্ট ১৬৩৯ তারিখে

> **গোটা বিশ্ব এখন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করতে উদ্‌গ্রীব। আগামী দিনে ভারত অর্থনীতিতেও বিশ্বে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানলাভ করতে চলেছে, মহাকাশ গবেষণায় ভারত এখন একটি অগ্রণী দেশ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের আত্মপরিচয়ের দ্যোতক ভারত নামটি বিশেষ প্রয়োজন।**

একটি দানপত্র দলিলের মধ্যে ছিল বলে জানা যায়। আরেকটি মত হলো চেন্না কেশব পেরুমাল মন্দিরের নামানুসারে শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল; তামিল ভাষায় চেন্নাই শব্দের অর্থ মুখ। মন্দিরটিকে শহরের মুখ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইংরেজরা ঔপনিবেশিক শাসনকে যুক্তিসম্মত ভাবে দীর্ঘায়িত করতে নামকরণের মাঝে লুকিয়ে থাকা ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মাইলফলক গুলো মুছে দিতে চেয়েছিল।

বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যগুলির নামও বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত অর্থ বহন করে। যেমন কেরালা। 'কেরল' নামের উৎপত্তি নিয়ে বহু মত বিদ্যমান। সবচেয়ে প্রচলিত মত অনুযায়ী নামটি 'কের' (মালয়ালম ভাষায় অর্থ 'নারকেল গাছ') এবং 'আলম' (অর্থ 'দেশ' বা 'ভূমি') শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্ট, যার অর্থ দাঁড়ায় 'নারকেল বৃক্ষের দেশ'। যেমন পশ্চিমবঙ্গ নামটি আমাদের স্মরণ করায় পূর্ববঙ্গ বলে কোনো একটা স্থান ছিল যা কিনা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী অনেক হিন্দুর পূর্বপুরুষের ভিটে। দেশভাগের সেই ভয়ংকর যন্ত্রণায় ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হয়। তবে এরকম নাম রাখা হয়েছিল যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আর ওই ধরনের দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন না হতে হয়।

নামকরণে বিজ্ঞানসম্মত বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষে সময় গণনার জন্য যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতেও বিজ্ঞানসম্মত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। যেমন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়- শ্রাবণের মতো প্রত্যেকটি মাসের নাম গুলির উৎস কোনো না কোনো মহাজাগতিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত রাশি বা নক্ষত্রের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে এবং প্রকৃতির পরিবর্তন এই মহাজাগতিক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেই আসে। ইংরেজি মাসের নাম জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ এগুলো একটা শব্দ মাত্র, কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বা বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয় না। বিভিন্ন বারের নামের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি। যেমন মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এগুলো সবই এক একটা গ্রহের নাম।

সেজন্য এমন একটা দেশ যেখানে প্রত্যেকটি নামবাচক শব্দ কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য, সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। সেই দেশটির নিজের নামকরণ এমন অর্থপূর্ণ শব্দ হবে যা কিনা এই দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটাবে।

আমাদের দেশের প্রাচীন নামগুলো বিশেষ অর্থ এবং সেই স্থানের বৈশিষ্ট্য বহন করে। যেমন, অযোধ্যা। অযোধ্যা মানে হলো যার সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব।

ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রেও সেই পরিবারের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রতিফলন থাকে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিবারগুলোর নাম সেই পরিবারের ইষ্ট দেবতার নামের সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্য থাকে। যেমন নারায়ণ, রাম, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি।

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ও ফলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যেমন আমলকি বা আমলা যার অর্থ হলো অমৃত ফল। জীবনদায়ী বিরল ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ বলে একে অমৃত ফল বলা হয়। সেজন্যই এরকম নামকরণ। ইংরেজিতে আমলকিকে বলা হয় Indian gooseberry, যার অর্থ ভারতীয় বৈঁচিজাতীয় ভক্ষণযোগ্য ফল। এই বৈঁচি জাতীয় ভক্ষণ যোগ্য ফল অনেক রকমের হতে পারে। এবং এই নাম দিয়ে আর যাইহোক আমলকিকে নির্দিষ্ট করে বোঝানো সম্ভব নয়। যেমন আঙ্কেল বা আন্টি এই সম্বোধন দিয়ে কাকু বা জেঠু কিংবা কাকিমা বা জেঠিমা ইত্যাদি নির্দিষ্ট সম্পর্ক বোঝা যায় না।

গুণানুসারে একাধিক নাম

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ১০৮টি নাম। প্রত্যেকটি নাম গুণানুসারে। যেমন, পুতনা রাক্ষসীকে বধ করেছিল পুতনা-নাশন, যশোদার পুত্র বলে নাম হয়েছিল যশোদানন্দন।

মহাজাগতিক বিভিন্ন অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলো সত্য। ইংরেজিতে সূর্যের একটিই নাম SUN। কিন্তু ভারতীয় ভাষাগুলিতে গুণ অনসারে সূর্যের অনেকগুলো নাম আছে। এক একটা নামের অর্থ দিয়ে সূর্যের এক একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, গ্রহের মধ্যে সূর্য হলো নবগ্রহের প্রধান। তাকে মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সূর্যের বারোটি আলাদা নাম হয়েছে এবং প্রতিটি নামের আলাদা অর্থও রয়েছে। মিত্র, রবি, সূর্য, ভানু, খগ, পূষণ, হিরণ্যগর্ভ, মরীচ, আদিত্য, সবিতৃ, ভাস্কর ও অর্ক। মিত্র সূর্যের প্রথম নাম। মিত্র শব্দের অর্থ 'সকলের বন্ধু'। এটি গ্রহদের অন্যতম রক্ষককে বোঝায় এবং এটি ভোরের আলো এবং সকালের সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

রবি সূর্যের আরেকটি নাম এবং এর অর্থ 'সকলের দ্বারা প্রশংসিত'। এটি বোঝায় যে রবির মতোই জীবনে আকর্ষণীয় রং নিয়ে আসে।

সূর্যের পরবর্তী প্রতিশব্দ সূর্য। সূর্যের অর্থ হলো 'সকলের পথপ্রদর্শক'। প্রাচীন সাহিত্যে, সূর্য একটি সংস্কৃত শব্দ যা অন্য কিছু নয় সূর্যকেই নির্দেশ করে।

সূর্যের পরবর্তী নাম হলো ভানু। ভানুর অর্থ হলো 'সৌন্দর্যের দাতা'।

খগ হলো সূর্যের আরেকটি প্রতিশব্দ এবং এর অর্থ হলো 'ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক'।

সূর্যের পরবর্তী প্রতিশব্দ হলো পূষণ। এর অর্থ হলো 'সকলের পুষ্টিদাতা'।

হিরণ্যগর্ভ সূর্যের আরেকটি নাম। এর অর্থ 'সৃষ্টিকর্তা'। হিন্দু দর্শনে যেমন বলা হয়েছে, হিরণ্যগর্ভ হলো সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টির উৎস এবং এটি বীজ গর্ভ।

সূর্যের আরেকটি প্রতিশব্দ মরীচ এবং এর অর্থ 'রোগ ধ্বংসকারী'।

আদিত্য সূর্যের আরেকটি নাম হিসেবে পরিচিত যার অর্থ 'অনুপ্রেরণাকারী'। তিনি অদিতির পুত্র। আদিত্যকে স্বর্গীয় নক্ষত্রপুঞ্জের উপর প্রভুত্ব দেওয়া হয়। নক্ষত্র বা জ্যোতিষ। আদিত্য মহাবিশ্বের সঠিক কার্যকারিতার জন্য দায়ী।

পুরাণ অনুসারে, সবিত্রী হলো সূর্যের প্রতিনিধি, সূর্যোদয়ের আগে সূর্য। সবিত্র শব্দের অর্থ 'উদ্দীপক'। তিনি সেই প্রভু যার

গতিশীলতা এবং স্থিতি রয়েছে এবং তিনি বিশ্বজগতের সমর্থক এবং সমস্ত প্রাণীর রক্ষক হিসেবে পরিচিত।

অর্ক হলো সূর্যের আরেকটি নাম যার অর্থ 'উষ্ণতার উদ্ভাবক।

সূর্যের শেষ এবং দ্বাদশ নাম ভাস্কর যার অর্থ 'মুক্তিদাতা'।

ভারতবর্ষেরও অনেকগুলো নাম, জম্বুদ্বীপ, আর্যাবর্ত, ভারত, হিন্দুস্থান, ইন্ডিয়া ইত্যাদি। জম্বুদ্বীপ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ধরলে এর মানে হয় জামগাছে ভরা দ্বীপ। কিন্তু সনাতন সৃষ্টিতত্ত্ব (মানে হিন্দু বৌদ্ধ কিংবা জৈন) অনুযায়ী জম্বুদ্বীপ মানে হলো 'সাধারণ মানুষের বাসস্থান'।

আর্যাবর্ত শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'আর্যদের ভূমি'। আর্য নামের অর্থ কী? আর্য নামের অর্থ হলো : পূজ্য; শ্রেষ্ঠ; মান্য; সুসভ্য, একজন শ্রদ্ধেয় বা সম্মানিত বা বিশ্বের মানুষ।

হিন্দুস্থান মানে হলো হিন্দুদের বসবাসের জায়গা। অর্থাৎ হিন্দুদের দেশ হিন্দুস্থান। ব্যুৎপত্তিগতভাবে হিন্দু শব্দটি দ্বারা সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসরত সকলকে বোঝানো হয়। ভারতের সংবিধানে হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করে যে কোনো ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসীকে (হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা শিখধর্ম) নির্দেশ করা হয়েছে।

ইংরেজিতে ইন্ডিয়া (India) কথাটি সিন্ধু নদের আদি ফার্সি নাম হিন্দু থেকে। প্রাচীন গ্রিকরা ভারতীয়দের বলত ইন্দোই বা 'ইন্দাস' (সিন্ধু) নদী অববাহিকার অধিবাসী। 'ইন্দাস' নাম থেকেই 'ইন্ডিয়া' নামটির উৎপত্তি। অর্থাৎ ইন্ডিয়া শব্দটি বিদেশিদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা একটা উচ্চারণ মাত্র। ইন্ডিয়া শব্দটি সিন্ধু নদীর অবহাহিকায় একটি ভূখণ্ডকে নির্দেশ করে, যা দিয়ে এদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি সভ্যতা বা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা পাওয়া যায় না।

এবার দেখে নেওয়া যাক ভারত শব্দের অর্থ কী। 'ভারত' প্রকৃতপক্ষে তিনটি শব্দ দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে।

ভা— ভাবনা বা প্রকাশ, ঈশ্বরীয় সত্য (সাময়িকরূপে সাদা জ্যোতিঃ-র প্রকাশ)

র— রজস বা রজঃগুণ (লোহিত বা লাল রঙ)।

ত— তমস বা তমঃগুণ (শ্যাম বা কৃষ্ণ)। 'রত' শব্দার্থে লীন হওয়া অর্থাৎ ভারত এমন দিব্যভূমি যেখানে বসবাসকারী লোক সত্যের অনুসন্ধানে ধ্যানে রত বা লীন থাকে। ভারত নামটিতে যেন সেই দিব্য ভূমির ছবি আঁকা রয়েছে।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য, হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষ তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।। (বিষ্ণুপুরাণ)। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে মহাসাগরের উত্তরে এবং বরফে ঢাকা পাহাড়ের দক্ষিণে অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত দেশের নাম ভারতবর্ষ এবং এই দেশের মানুষকে অভিহিত করা হয়েছে 'ভারতসন্ততি' রূপে।

ইতিহাসে 'ভারত' তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিদ্যা ধর্ম বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং পুরাণ বেদান্ত ও সাহিত্যের অধ্যাপক বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মিশ্র 'আজ তক'-এ একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে ইতিহাসে 'ভারত' তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে। একজন হলেন শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, দ্বিতীয় হলেন ভরত, রামের ভাই এবং তৃতীয় হলেন সবচেয়ে প্রাচীন ভারত, যিনি ভগবান বিষ্ণুর ২৪টি অবতারের একজন। তিনি ২৪টি অবতারের একজন এবং জৈন ধর্মের তীর্থঙ্কর আদিনাথ নামেও পরিচিত। তাঁর নাম 'ঋষভদেব' এবং 'ভারত' ঋষভদেবের ১০০ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে ইন্ডিয়া নাম দিয়ে শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ডকেই বোঝায় কিন্তু ভরত এই শব্দটি দিয়ে একটি উন্নত সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পরম্পরাসম্পন্ন ভূখণ্ডকে বোঝায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, ভারত নামটি কোনো ব্যক্তি বিশেষের দেওয়া এমনটি বোধহয় নয়, এদেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারত শব্দটি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়েছে না হলেও এই নামের মধ্যে পরাধীনতার গ্লানি রয়েছে। যেমন, ব্রিটিশরা বিশেষ সংরক্ষিত এলাকা সম্পর্কে বলতো 'ইন্ডিয়ানস অ্যান্ড ডগ আর নট অ্যালাউড হিয়ার'।

এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে যার থেকে প্রমাণ করা যাবে যে ভারতবাসীর উপর ঘৃণা ছড়ানোর জন্য এই ইন্ডিয়ান শব্দটি ব্যবহার করা হতো। তাছাড়া যারা এখনো বিদেশে থাকেন তাদের অনেকের মুখেই শুনেছি ইন্ডিয়ান বলে পরিচয় দিলে তাদের মনে এক ধরনের হীনমন্যতার জন্ম নেয়। সেজন্য দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য পরাধীনতার গ্লানি মুছে দেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান ভারত নতুনভাবে নিজের পরিচয় তৈরি করছে। গোটা বিশ্ব এখন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করতে উদ্‌গ্রীব। আগামী দিনে ভারত অর্থনীতিতেও বিশ্বে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানলাভ করতে চলেছে, মহাকাশ গবেষণায় ভারত এখন একটি অগ্রণী দেশ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের আত্মপরিচয়ের দ্যোতক ভারত নামটি বিশেষ প্রয়োজন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সঠিক পরিকল্পনা রাঢ় বঙ্গকে জাপান বানাতে পারে

সুদীপ্ত গুহ

স্বাধীনতার পর প্রথম দু' দশক ভারত সরকার সেচ, কৃষি, শিল্প গবেষণা, শিক্ষা এবং নগরোন্নয়ন-সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনো ভূখণ্ডে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ এবং বিনিয়োগ করে, তবে সেটা এই রাঢ় বঙ্গ। উন্নতিও করেছে প্রথম দু' দশক। কিন্তু বিদেশ থেকে পিএইচডি করা দু'জন অর্থনীতিবিদ (ড. অশোক মিত্র এবং ড. অসীম দাশগুপ্ত) যেভাবে এই হিরের খনিকে দাস ক্যাপিটাল তত্ত্বের গিনিপিগ পরীক্ষাগার বানিয়ে ছাড়েন, তাতে এই ভূখণ্ড আজ পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে পরিণত হয়। এটা মার্কসবাদী অর্থনীতির একটা গবেষণার কেস স্টাডি হতে পারে। দেশভাগের সময় জিন্না পুরো বঙ্গ প্রদেশ চেয়েছিলেন তিনটি কারণে। এক, বাণিজ্য নগরী কলকাতা, দুই, রাঢ় বঙ্গের খনিজ সম্পদ ও জল সম্পদ, তিন, উত্তরবঙ্গের চা-বাগান। জাপানিরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন এক ভূখণ্ড হাতে পেত, আজ তারা চীন বা আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যেত। সেই সময় ড. প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ বিধান রায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ড. প্রশান্ত মহলানবীশ, ড. মেঘনাদ সাহারা সেটা বুঝতে পারেন, ফলত পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়। নেহরুও মেনে নেন। নেহরু বোঝেন পুরো উত্তর ভারতকে বাঁচাতে পারে এই রাঢ়বঙ্গ। বিনিয়োগ হয় ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, দামোদর জল প্রকল্পে। তৈরি হয় আসানসোল, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, হলদিয়া, খড়্গপুর। রঘুনাথপুরে তৈরি হয় উন্নত পরিকাঠামো। বন্দর পায় হলদিয়া। দুর্গাপুর ও খড়্গাপুরে তৈরি হয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র। বহু রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্পের বিনিয়োগ হয় এখানে। দমদম ও যাদবপুরের বহু পূর্ববঙ্গের পরিবার পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে আশ্রয় নেয় দুর্গাপুরে। সেচপ্রকল্প এমন আকার নেয় যে চাষিদের আয় বেড়ে হয় কয়েক গুণ।

আর এর সুযোগ নিয়েই ষাটের দশকে এই ভূখণ্ড থেকে সমান্তরালভাবে উঠে আসে একের পর এক শ্রমিক ও কৃষক নেতা। পরিকল্পনামাফিক মস্তিষ্ক প্রক্ষালন শুরু হয় স্কুলে, কলেজে দাস ক্যাপিটাল তত্ত্ব গেলানোর মধ্য দিয়ে। শুরু হয় খুনের রাজনীতি। আত্মঘাতী আন্দোলনে এবং সরকারি ভূমি সংস্কার প্রকল্পে শেষ হতে থাকে রাঢ় বঙ্গ। খুনের রাজনীতি করে উঠে আসা নেতারাই পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের মূল চালক হয়ে ওঠে। যেমন হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় কোঙার, অনিল বসু, লক্ষ্মণ শেঠ ইত্যাদি। আজকে ৭০ শতাংশ ঘর বৃদ্ধাশ্রম। জনবিন্যাস দ্রুত পালটাচ্ছে। বহু গ্রাম হিন্দুহীন।

> **মাত্র আধা দশক সঠিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঠিক পথে চললে স্বর্গ হয়ে যাবে এই রাঢ়বঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে ম্যাজিক দেখিয়েছে জাপান ও পশ্চিম জার্মানি, সেই ম্যাজিক দেখাতে পারে রাঢ়বঙ্গ। খনিজ সম্পদ, জলসম্পদ ও মানব সম্পদের এমন সমাহার পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।**

খুব শীঘ্রই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পুরো উত্তর ভারতকে বড়ো দাম চোকাতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর পাকিস্তান পরবর্তীতে বাংলাদেশে চলে যাওয়ায় যেভাবে ভুগছে উত্তরপূর্ব, ঠিক সেইভাবে।

ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলে বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার শুরু করেন। বহু রাজ্যে মানুষের প্রতিবাদে পিছিয়ে আসে কেন্দ্র সরকার। যেমন অন্ধ্রপ্রদেশে নরসীমা রাও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সফল হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং পরবর্তীকালে জ্যোতি বসু। প্রসঙ্গত, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। ওই সময় ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ যে দলের সদস্য ছিলেন, তার নাম কংগ্রেস (আর), সোভিয়েত গুপ্তচর সংস্থা কেজিবির অনুপ্রাণিত একটি কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র। তাই জমির মালিকানা কেড়ে নেওয়া তাঁদের আদর্শগত জায়গা থেকেই এসেছে। কিন্তু এর ফলে বহু সমস্যার সম্মুখীন হলো গ্রামবাঙ্গলার কৃষি। জমির মালিকরা বিনিয়োগ বন্ধ করে দেন। নতুন চাষিরা ছোটো জমি চাষ করা শুরু করে। চাষের খরচ মিটিয়ে এবং মহাজন, জমির মালিক, রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে যে পয়সা থাকতো, তাতে লাভ এত কম হতো যে ট্র্যাক্টর বা উচ্চমানের সার কেনার পয়সা থাকত না। ব্যাংক জাতীয়করণ হলেও ব্যাংকের খাতা আমাদের দেশের ৯০ শতাংশ চাষি খোলে ২০১৪-র পর। সেই সময় মূলধন হিসেবে তাঁদের চড়া সুদে ধার নিতে হতো মহাজনদের থেকেই। ফলে লাভের গুড় পুরোটাই যেত পিঁপড়ের পেটে। বাম সরকার এলে সেচ দপ্তর পায় আরএসপি। এক্ষেত্রে সিপিএমের অর্থমন্ত্রীরা সেচে বরাদ্দ কমাতে থাকলে, সেচ খালগুলি অচল হতে থাকে। দামোদর খালগুলিতে সাম্প্রতিককালে সংস্কার শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায়। কিন্তু ময়ূরাক্ষী

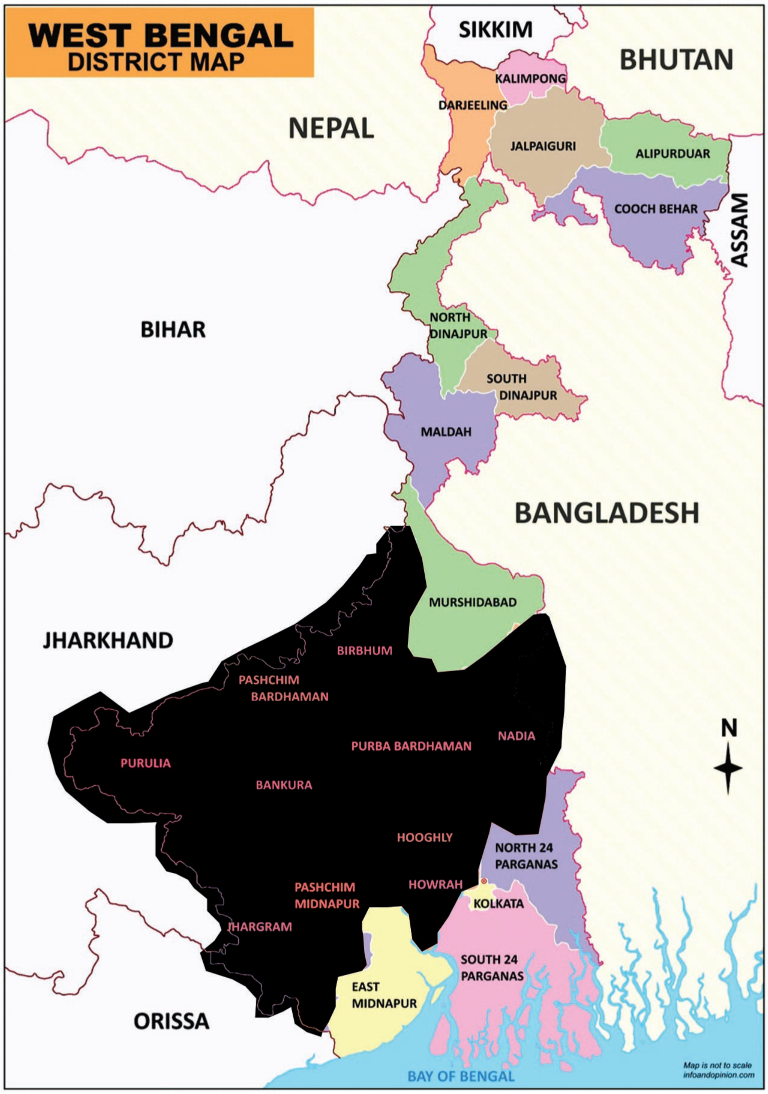

বা কংসাবতীর অবস্থা বেশ খারাপ। সুবর্ণরেখা, দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী- নুনবিল, ঘাটাল ইত্যাদি প্রকল্প আজও শুরু হয়নি। কিন্তু চাষ তো থেমে থাকে না! ভূগর্ভস্থ জল যথেচ্ছভাবে তোলা শুরু হয়। ফলে জলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ইত্যাদি মিশতে থাকে। যা পানীয় জল ও ফসল দুটোকেই নষ্ট করে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা যে ক্ষতিপূরণ দেয়, তার একটা বড়ো অংশ পশ্চিমবঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে খরচ করা হয় এই ভেবে যে এঁরা বাকি রাজ্যগুলোকে বাঁচাবে। দুর্গাপুর, হলদিয়া তৈরি হয়। কেন্দ্রের টাকায় একের পর এক বড়ো, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প তৈরি হয় চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, দুর্গাপুর, খড়্গপুর, হলদিয়াতে। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসতেই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মীদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। অফিসের ড্রাইভার, দপ্তুরিরা পর্যন্ত ঠিক করত কোথা থেকে কাঁচামাল কেনা হবে কিংবা অফিসে বাতানুকূল মেশিন থাকবে কিনা। সরকারি আধিকারিকরাও ধীরে ধীরে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা বন্ধ করে সরকারি দলের আনুগত্য দেখিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে থাকে। খনি এলাকায় এঁদের অনেকেই পঞ্চায়েত নেতা হয়ে গেলে আধিকারিকরা ভয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া বন্ধ করে। ভেঙে পড়ে একের পর এক শিল্প শহর। দোষ পড়ে মাশুল সমীকরণ নীতির। কিন্তু মাশুল সমীকরণ যদি একা এ রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী হতো, তবে ১৯৯৩-তে এই আইন উঠে যাওয়ার ৩০ বছর পরেও কেন পশ্চিমবঙ্গ আর শিল্পায়ন করতে পারলো না? আসল কারণ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, পরিকল্পনার অভাব এবং ভুল অর্থনীতি।

কিন্তু কীভাবে আগামীদিনে এগোবো আমরা এবং কতটা এগোনো যায়?

প্রথমে শুরু করতে হবে ১০০ শতাংশ কেন্দ্র অনুমোদিত সবকটি পরিকাঠামো প্রকল্প যেখানে রাজ্যের বিনিয়োগ সীমিত। এতে মানুষের হাতে অর্থও আসবে। ব্যবসা বাড়বে। রাজ্য কর বাবদ আয় বাড়াবে। যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যের ভাগ্য পালটে দিতে পারে, কিন্তু বর্তমান সরকারের অসহযোগিতার জন্য সফল হয়নি, তার মধ্যে আছে কাশী- কলকাতা জাতীয় সড়ক, লুধিয়ানা-ডানকুনি ফ্রেট করিডোর, মোড়গ্রাম- হলদিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, মুম্বই-কলকাতা, ফ্রেট করিডোর, অমৃতসর- কলকাতা শিল্প করিডোর, ইস্টকোস্ট শিল্প করিডোর। তবে করিডোরগুলো কলকাতা, ডানকুনি বা হাওড়ার শেষ না করে নিয়ে যেতে হবে হলদিয়া বন্দরের কাছাকাছি। আর হলদিয়া থেকে নয়াচর হয়ে সাগরে নিয়ে যেতে হবে সড়ক ও রেল পথ, যেখানে বানাতে হবে গভীর সমুদ্র বন্দর। এই প্রকল্পেরও অর্থ ২০১৬-তে কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে। কিন্তু রাজ্য চায় তাজপুরে এই কাজ হোক, যা সম্ভবত ভুল সিদ্ধান্ত। এছাড়া রাজ্যকে রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং জেলা সড়ককে উন্নীত করতে হবে কম করে চার লেন রাস্তায়। অন্ডাল বিমানবন্দরকে ঘিরে বানাতে হবে রপ্তানি জোন। পানাগড়, রঘুনাথপুর, অন্ডাল, দুর্গাপুরের সঙ্গে জুড়তে হবে ওই বন্দরকে। অন্ডালকে কেন্দ্র করে বানাতে হবে আরও কিছু স্যাটেলাইট উচ্চপ্রযুক্তি নগরী। অনুরূপ একটা বিমানবন্দর চাই খড়্গপুর ও হলদিয়ার মধ্যে। তাকেও যুক্ত করতে হবে কিছু স্যাটেলাইট উচ্চপ্রযুক্তি নগরীর সঙ্গে। এবং এই পুরো পরিকল্পনাকে যুক্ত করতে হবে অমৃতসর- কলকাতা শিল্প করিডোর এবং ইস্টকোস্ট শিল্প করিডোরের সঙ্গে যাতে কেন্দ্র ও বিদেশি ব্যাংক থেকে অর্থ পাওয়া যায় এবং কাজের সঠিক মান বজায় রাখা যায়। মোড়গ্রাম-হলদিয়া সড়ক তৈরি হলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সংযোগকারী অন্যতম স্ট্র্যাটেজিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক রপ্তানি করিডোর হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় একটি কর্পোরেশন বানিয়ে এই শিল্প করিডোরকে গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসন সঠিক হলে, জাপান এই প্রকল্পে বিনিয়োগ

করতে পারে, যেমন দিল্লি, মুম্বই শিল্প করিডরে তারা করেছে।

কৃষিক্ষেত্রেও এই রাঢ়বঙ্গ প্রচুর সম্ভাবনাময়। স্বাধীনতার পর এবং সবুজ বিপ্লবের দশ বছর আগে ময়ূরাক্ষী ও দামোদর প্রকল্প শেষ হয়। সবুজ বিপ্লবের সময় লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং প্রফুল্ল সেন শুরু করেন কংসাবতী প্রকল্প। কিন্তু বামফ্রন্ট আসার পর সুবর্ণরেখা, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান, দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী-নুনবিল ইত্যাদি সেচ প্রকল্পে বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। খুব শীঘ্রই এই চারটি প্রকল্প শুরু করে পুরো রাঢ়বঙ্গের প্রতিটি চাষের জমি সেচের অধীনে আনতে হবে। এখানে কিছু ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক বিনিয়োগ করেছে। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ সেচকে এক ছাতায় আনতে, রাজ্যের সেচ, ক্ষুদ্র সেচ এবং জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে মিশিয়ে একটিমাত্র দপ্তরে পরিণত করতে হবে। এরপরে সেই দপ্তরের মালিকানায় সাতটি আলাদা বহুমুখী জল কোম্পানি খুলতে হবে। বহুমুখী মানে একই কোম্পানি শিল্প, বাণিজ্য, গৃহ ও সেচের জল দেবে। ১. ময়ূরাক্ষী, ২. দামোদর, ৩. কংসাবতী, ৪. রূপনারায়ণ, ৫. দ্বারকেশ্বর, ৬. সিদ্ধেশ্বরী, ৭. সুবর্ণরেখা। কোম্পানি খোলার ফলে প্রথম যে সমস্যা সমাধান হবে সেটা হলো অর্থ সমস্যার সুরাহা। কোম্পানিগুলি বিশ্বব্যাংক/এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা জাপানি ব্যাংক থেকে লোন পাওয়া কিংবা সেবি নিয়ম মেনে পরিকাঠামো বন্ড ইস্যু করে টাকা তোলা যেতে পারে। কোম্পানিগুলি জমির দাম বাবদ জমির মালিকদের শেয়ার বা বন্ডও বিক্রি করতে পারে।

কিন্তু তার সঙ্গে সংস্কার করতে হবে কৃষি বিপণনের। যে কৃষি বিল মোদীজী ফিরিয়ে নিয়েছেন অন্যায় আন্দোলনের ফলে, সেই ধাঁচেই বিল এনে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার করে কৃষি রপ্তানি বাড়িয়ে চাষিদের আয় বাড়াতে হবে। ভূমি সংস্কারের ফলে জমির মালিকানা এমন জায়গায় আছে যে চাষের ভাগ নিয়ে সমস্যা প্রচুর। ফলে আজকের দিনে হাজার হাজার একর জমি খালি রেখে চাষিরা কাশ্মীর থেকে মিজোরামে অন্যের জমিতে খাটতে যাচ্ছে। তাই প্রয়োজন কর্পোরেট ফার্মিং পদ্ধতি। বন্ধ করতে হবে জমি দখলের সংস্কৃতি, যা অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের স্বপ্ন ছিল এবং সোভিয়েত যুগে ইন্দিরা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় শুরু করেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসুরা। অর্ধশতাব্দী চলা এই মাৎস্যন্যায় ঠেকাতে প্রয়োজন কঠোর আইনি সংস্কার।

রাঢ় বঙ্গের আরও একটা বড়ো সম্ভাবনা হস্তশিল্প। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যা বিপননের। বর্ধমানের নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল, বাঁশের চাঙ্গারি, মেদিনীপুরের জো পুতুল, বাঁকুড়ার টুসু পুতুল, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার ডোকরা, বর্ধমানের তালপাতার সেপাই, মেদিনীপুরের দীপলক্ষ্মী পুতুল, নকশি কাঁথা, পিঁড়ি, বাঁকুড়ার ঘোড়া, মেদিনীপুরের দেশি পুতুল, বাঁকুড়ার বোঙাহাতি, মেদিনীপুরের মাদুরকাঠি, হাওড়ার রানি পুতুল, বাঁকুড়ার হিঙুলপুতুল, শান্তিনিকেতনের ব্যাগ, বিষ্ণুপুরের ঘোড়া, চন্দনপুরের তামা ও ব্রঞ্জের বাসন-সহ বহু উদাহরণ আছে রাঢ় বঙ্গের হস্তশিল্পের উৎকর্ষের। কিন্তু বাজার চেনে না শিল্পীরা। তাই সঠিক দাম পাওয়া যায় না। মোদীজী আগামী দিনে ONDC প্লাটফর্ম তৈরি করছেন খুচরো বিক্রেতাদের জন্য। এক্ষেত্রে SKILL INDIA প্রকল্পে প্রত্যেক শিল্পীর সফটওয়্যার স্কিল বাড়িয়ে, এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করে তাঁদের সঙ্গে রপ্তানিমূলক সংস্থা, ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ও কুরিয়ার কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে হবে তাঁদের শিল্পকে এবং চিরতরে শেষ করা যাবে তাঁদের দারিদ্র।

এই অঞ্চলের আরেকটা সমস্যা হলো সরকারি আধিকারিকরা পরিবার নিয়ে থাকতে চান না রাঢ় বঙ্গের ছোটো শহর বা গ্রামে। কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের অভাব। এক্ষেত্রে, আয়ুষ্মান ভারত এবং বিভিন্ন সরকারি চিকিৎসা বিমার পলিসি মানুষের হাতে তুলে দিতে হবে, যাতে বেসরকারি হাসপাতাল কোম্পানি এখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখায় বিভিন্ন ব্লকে। সঙ্গে উন্নত করতে হবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও। প্রয়োজনে আয়কর বা পাশপোর্ট দপ্তরের মতো সফটওয়্যার কোম্পানিকে ব্যবহার করতে হবে মানুষকে সরকারি পরিষেবায় পাওয়া রাস্তা সহজ করতে। সঙ্গে প্রয়োজন ভালো বেসরকারি স্কুলের। সরকারি স্কুলে প্রয়োজন স্মার্ট ক্লাস, যাতে প্রত্যন্ত গ্রামেও উচ্চমানের শিক্ষা পাওয়া যায়। এই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিকাঠামো সরকারি আধিকারিকদের উৎসাহ দেবে ছোটো শহরে বা গ্রামে থাকার। সরকারি আধিকারিকরা গ্রামে বা ছোটো শহরে সপরিবারে থাকলে সেখানে বাজারে অর্থ আসবে। বাজার চাঙ্গা হবে। এছাড়া, খড়্গপুর ও দুর্গাপুর ছাড়াও আরও কিছু শিক্ষা/স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র প্রয়োজন, যাতে কিছু উচ্চ আয়ের মানুষ সেখানে গিয়ে বাজার চাঙ্গা করে। সিউড়ি, চন্দননগর, অন্ডালকে ভাবা যেতে পারে।

তবে অযথা বড়ো উৎপাদন শিল্প এনে সমস্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। পানাগড়, খড়্গপুর ও রঘুনাথপুরে কিছুটা ম্যানুফ্যাকচারিঙের ব্যাপারে অবশ্য ভাবা যেতে পারে। কিন্তু জোর দিতে হবে পরিকাঠামো, কৃষি, হস্তশিল্প, বাণিজ্য, পরিষেবা ও গবেষণায়। পরিষেবা শিল্পের মধ্যে আছে সফটওয়্যার, ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিসিন/অর্থ/আইন আউটসোর্সিং, শিক্ষা, এনার্জি ইত্যাদি। উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতের উৎপাদন হাবের পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। বাঙ্গালির মানসিকতার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। উৎপাদন ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চীন, ভিয়েতনাম বা মেক্সিকো। আর এই শিল্পে বাধা তাঁদের বামপন্থী আধা-ভাইদের ট্রেড ইউনিয়ন। কিন্তু পরিষেবা বাঙ্গালির রক্তে। সঙ্গে গবেষণার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আমেরিকা গবেষণার পেটেন্ট থেকে যা আয় করে তা আমাদের দেশের জিডিপির চেয়ে বেশি। পরিবেশ ফিরে এলে আবার বাঙ্গালি ফিরে পাবে সত্যেন বোস, জগদীশ বোস, মেঘনাদ সাহার যুগ। এমন পরিবেশ দিতে হবে যেখানে ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রাণ না চলে যায়।

শেষে বলি, মাত্র আধা দশক সঠিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঠিক পথে চললে স্বর্গ হয়ে যাবে এই রাঢ়বঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে ম্যাজিক দেখিয়েছে জাপান ও পশ্চিম জার্মানি, সেই ম্যাজিক দেখাতে পারে রাঢ়বঙ্গ। ভগবানের দেওয়া খনিজ সম্পদ, জলসম্পদ ও মানব সম্পদের এমন সমাহার পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। শুধু মার্কসবাদ ফেলে চাণক্য পণ্ডিতের অর্থশাস্ত্র ধ্রুব সত্য বলে এগিয়ে যেতে হবে। □

‘চীন অধিকৃত কাশ্মীর’-এর বিস্মৃত কাহিনি

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

১৯৪৭-এর অক্টোবরে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৮-এ পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরের বিশাল এলাকা দখল করে যা পিওকে নামে পরিচিত; ১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধে চীন কাশ্মীরের আকসাই চীন দখল করেছে। আবার ১৯৬৩ সালের পাক-চীন চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান চীনকে শাক্সগাম উপত্যকার ৫১৮০ বর্গ কিমি এলাকা দান করেছে, দুটো মিলিয়ে সিওজেকে নামে পরিচিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক আঙিনায় জম্মু-কাশ্মীর শুধু ভারত-পাকিস্তান সমস্যা (পিওজেকে) থেকে গেছে। ভারতের মানুষ চীনের দখলদারির (সিওজেকে) বিষয়টা বেমালুম ভুলে যায়, চীনের চালাকিটা কারও নজর কাড়ে না, খবরও হয় না, কোনো বিতর্কও হয় না। ঔপনিবেশিক আমল থেকে চীনের বিশ্বাসঘাতকতা ও অনৈতিক ঐতিহাসিক কারসাজি আড়ালে রয়ে গেছে। কাশ্মীর ইস্যুতে চীনের গেমপ্ল্যান, প্রতারণা ও সুবিধাবাদ বুঝতে ইতিহাস ঘাঁটতে হবে।

১৯৪৭ সালের সীমান্ত :

ঐতিহাসিকভাবে চীনা সীমানা কুন লুন রেঞ্জ বরাবর শেষ হয়েছিল এবং এই পর্বতগুলোর দক্ষিণে চীনের কোনো এক্তিয়ার ছিল না। ১৯ শতকের শেষ দশকে ব্রিটিশ নীতির ফলস্বরূপ চীনারা রাস্কাম উপত্যকার কুন লুনের দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে যেতে শুরু করেছিল। এতদসত্ত্বেও আঘিল রেঞ্জের দক্ষিণে ‘শাক্সগাম’ উপত্যকায় চীনের কোনো যুক্তিযুক্ত দাবি বা উপস্থিতি ছিল না।

১৯৩৬ সালে হুনজার মীরকে চীনাদের সঙ্গে ভূখণ্ড উপহার বন্ধ করা এবং রাস্কামের ওপর হুনজার অধিকার ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়ার পরে ১৯৩৮-’৩৯ সালের শেষের দিকে তদানীন্তন ভারত সরকার শাক্সগাম অঞ্চলে তার অবস্থান পুনরুদ্ধার করেছিল। তাই ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত উত্তরাধিকারসূত্রে যে সীমানা পেয়েছিল তার মধ্যে ভারতীয় ভূখণ্ড হুনজা এবং ‘শাক্সগামের ট্রান্স-কারাকোরাম ট্র্যাক্ট’ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মুস্তাঘ-আঘিল-কারা তাগ-কুন লুন রেঞ্জ বরাবর অবস্থিত ছিল।

উপনিবেশ পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৬৩-এর ২ মার্চ চীন-পাকিস্তান সীমানা চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান ভারতের অধিকার লঙ্ঘন করে ‘ট্রান্স-কারাকোরাম ট্র্যাক্টের শাক্সগাম’ উপত্যকার ৫১৮০ বর্গ কিমি এলাকা দান করেছিল; সেই এলাকাও চীন কর্তৃক ১৯৬২ সালে অবৈধভাবে দখলীকৃত জম্মু-কাশ্মীরের আকসাই চীনের প্রায় ৩৮০০০ বর্গ কিমি অঞ্চলও কাশ্মীর সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। এই চুক্তিতে হুনজার ওপর চীন তার বিশেষ দাবি ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে রাস্কামের সঙ্গে শাক্সগাম এলাকাও নিয়ে নিয়েছিল।

কারাকোরাম রেঞ্জ বরাবর চীনের সীমানায় দাবি মেনে পাকিস্তান শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিমে কুন লুন রেঞ্জ বরাবর ভারতের অধিকার খর্ব করেনি, কুন লুনকে চীন-ভারত সীমানা হিসাবে অস্বীকার করার সুযোগ চীন পেয়েছিল। তাই ট্রান্স-কারাকোরাম ট্র্যাক্টে চীনের দাবির সঙ্গে ওই গিরিপথের পূর্ব দিকে চীনের অবস্থানের কোনো সম্পর্কই ছিল না, কারণ আকসাই চীন এলাকায় চীনের কোনো ঐতিহাসিক দাবি ছিল না।

১৯৬৩ সালের চুক্তির আগের সব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে চীন ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিক থেকেই জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সীমান্তে তার দাবি জানাতে শুরু করেছিল। ২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৯-এ চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে চিঠি দিয়ে এই দাবিগুলো পেশ করেছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে চীনা সেনা পূর্ব হুনজা অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। তখন চীন-পাকিস্তানের এই বন্ধুত্ব ছিল না। ১৯৫৯-এর অক্টোবরে পাকিস্তানি মিডিয়া এই অনুপ্রবেশের খবর দেয়। চীনা সৈন্যরা সেখানে কিছু গবাদি পশু হত্যা করে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে পাকিস্তান সম্ভাব্য সব উপায়ে তার সীমান্ত রক্ষা করবে। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে ভারত-চীন সম্পর্কের তীব্র অবনতির ফলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান চীনকে তোয়াজ করার সুযোগ নিলেন। হুনজা উপত্যকায় চীনা অনুপ্রবেশ সামাল দিতে তিনি

সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বেজিঙের সঙ্গে যোগাযোগের পথ খোলেন।

অন্যদিকে ১৯৫৬-র ১৬ মার্চ চৌ এন লাইয়ের কাছ থেকে ভারত আশ্বাস পায় যে কাশ্মীরের জনগণ ইতিমধ্যেই তাদের মত প্রকাশ করেছে এবং ১৯৬১-র ১৬ জুলাই লাই জানান যে চীন কখনও কোনো নথিতে বলেনি যে কাশ্মীর ভারতের অংশ নয়। এইভাবে কাশ্মীর নিয়ে চীন তার অবস্থানকে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এতে চীনের সুনজরে থাকার জন্য আয়ুব খান আরও চাপে পড়েছিলেন। ১৯৬০-এর জুন-ডিসেম্বর পর্বে ভারত-চীন সীমান্ত আলোচনার ব্যর্থতা, ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পরে এই অঞ্চলে পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতি, সেই সঙ্গে ভারতের জন্য পশ্চিমি সামরিক সমর্থনের ইঙ্গিত চীন ও পাকিস্তানকে কাছাকাছি আনে।

দুই বছর ধরে নানা আলোচনায় পাকিস্তান চীনের কাছে বিতর্কিত অঞ্চল দান করার পথ প্রশস্ত করতে হুনজার মীরের ঐতিহাসিক দাবিগুলিকে পদ্ধতিগতভাবে নস্যাৎ করার জন্য অবিশ্বাস্য যুক্তি দেখিয়েছিল। ১৯৬০-এর মে মাসে পাকিস্তান জানিয়েছিল যে তারা চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৫ জানুয়ারি, ১৯৬১ তারিখে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিডিয়াকে বলেছিলেন চীন পাকিস্তানের সঙ্গে তার সীমানা নির্ধারণে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে, এই বিষয়ে আলোচনা চলছে। ১৯৬১-র মে শেষে চুক্তির রূপরেখা সাকার হতে শুরু করে, অথচ তখনও পর্যন্ত বেজিং দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতকে আশ্বস্ত করে যে চীন পাকিস্তানের সঙ্গে কিছু আলোচনা করেনি।

১৯৬২ সালের গোড়ায় চীন ও পাকিস্তান উভয় পক্ষের সব দাবি সহ মানচিত্র বিনিময় হয়েছিল। পরিহাসের বিষয়, পাকিস্তান সার্ভের তৈরি মানচিত্রে শাক্সগাম উপত্যকা এবং জিনজিয়াঙের অংশগুলোকে পিওকে-র মধ্যে দেখানো হয়েছিল। পরে পাকিস্তানি নেতৃত্ব অস্বীকার করে বলেছিল যে মানচিত্রে অনির্দিষ্ট সীমান্তরেখা আঁকার কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ছিল না! আরও মজার ব্যাপার, ট্রান্স-কারাকোরাম ট্র্যাক্টে চীনের দাবির চেয়ে বেশি স্ট্র্যাটেজিক এলাকা পাকিস্তান চীনকে দেয়। পরে চীন তার মানচিত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। শীঘ্রই পাকিস্তান এর সুফল পায়। ১৯৬২-র ৩১ মে প্রথমবার বেজিঙে ভারতীয় দূতাবাসকে 'নোট'-এর মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে কাশ্মীরে ভারতের অধিকার চীন কখনোই মেনে নেয়নি।

ভারতের প্রতি আমেরিকার সমর্থনে হতাশ পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতকে রাজি করাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিংহ (ডিসেম্বর ১৯৬২-মে ১৯৬৩) -এর ছ'দফা আলোচনা ব্যর্থ হয়, মূলত ১৯৬৩ সালের ২ মার্চ পাকিস্তান-চীন সীমান্ত চুক্তির কারণে। মার্কিন ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর বলে ওই চুক্তি আলোচনার 'ক্ষীণ সম্ভাবনাকে শেষ করেছে'।

১৬ মার্চ, ১৯৬৩-তে ভারত সরকার কিছু তথ্য প্রকাশ করে। যেমন, ঐতিহ্যগতভাবে কারাকোরাম গিরিপথের পশ্চিমের সীমানা জলবিভাজিকা বরাবর প্রবাহিত ছিল, যা ইয়ারখন্দ ও হুনজা নদীর উপনদীগুলোকে বিভক্ত করেছে এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে বিভিন্ন গিরিপথকে সংযুক্ত করেছে। যেমন, কিলিক, মিন্টাকা, কারচানাই, পারপিক ও খুঞ্জেরাব। খুঞ্জেরাব থেকে এটি শাক্সগাম নদী অতিক্রম করে এবং আঘিল পর্বতমালা বরাবর, আঘিল, মারজো, শাক্সগাম ও কারাকোরাম পেরিয়ে কুন লুন রেঞ্জ পর্যন্ত চলে যায়। চীনের ১৯১৭ সালের মানচিত্রে আঘিল ও কুন লুন রেঞ্জে জিনজিয়াঙের দক্ষিণ সীমানা দেখায়। জিনজিয়াঙের ১৭৬২ সালের মানচিত্রও দেখায় যে এর দক্ষিণ সীমান্ত শুধুমাত্র কুন লুন রেঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। হুনজার পূর্ব দিকে শাক্সগাম উপত্যকা চীনের হাতে তুলে দিতে পাকিস্তান মারাত্মক দরকষাকষি করেছিল, তাই এই তথ্যগুলো উপেক্ষা করা হয়েছিল।

এই চুক্তির ছাড়গুলো পাকিস্তানি জনগণ এবং বিরোধী প্রেসকে জানানো হয়নি। মে ১৯৬২-র যৌথ বিবৃতিতে বদল আনা হলো। 'যে এলাকার প্রতিরক্ষা পাকিস্তানের দায়িত্ব' বদলে বলা হলো 'সংলগ্ন এলাকা' যাতে চীনের প্রতি পাকিস্তানের অসমঞ্জস ছাড়গুলো লুকিয়ে রাখা যায়। ১৯৬৩-র চুক্তির পর এই সীমান্তকে চিত্রিত করে দুই দেশের প্রচারিত মানচিত্রেও অসঙ্গতি ছিল। ঐতিহাসিকভাবে বললে কে-২ পর্বতের ওপর চীনের কোনো দাবি ছিল না।

২০১৯-এর আগস্টে ৩৭০ ধারা বাতিলের পরে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও আকসাই চীন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে পাকিস্তান দ্বারা চীনকে অবৈধভাবে হস্তান্তরিত 'শাক্সগামের ট্রান্স-কারাকোরাম ট্র্যাক্ট'ও আছে। পাক প্রধানমন্ত্রী ২০২০-র ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে কাশ্মীর ইস্যু তুলেছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি পাকিস্তানের কটূক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন 'একমাত্র বিরোধ আছে পাকিস্তানের দখলে থাকা কাশ্মীরের বাম অংশে'।

২০২০-র ১২ অক্টোবর, কোর কমান্ডার পর্যায়ে ভারত-চীনের মধ্যে সপ্তম দফা আলোচনা শেষে চীনা পররাষ্ট্র মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান বলেছিলেন, 'চীন ভারতের 'লাদাখ' ইউনিয়ন ও 'অরুণাচল প্রদেশ'কে স্বীকৃতি দেয় না। তিনি অভিযোগ করেছেন সীমান্ত এলাকায় ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়ন কার্যকলাপ উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে। উত্তরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ১৫ অক্টোবর বলেছিলেন, 'ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করার অধিকার চীনের নেই এবং জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে ও থাকবে'।

কাশ্মীর ইস্যুতে চীনের দখলদারি ভারতে ও বহির্বিশ্বে কৌশলগত বিশ্লেষক ও ভাষ্যকারদের যথেষ্ট মানোযোগ পায়নি। জম্মু-কাশ্মীর ভূখণ্ডের দখলদার হিসেবে তার চেহারা পর্যাপ্তভাবে প্রচার হয়নি বলে বিষয়টিতে চীন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। চীনবিষয়ক গবেষকদের লেখায় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামের বিবৃতিতে এটা প্রকাশ করা উচিত। নেহরু রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতে স্থায়ী সদস্যতা চীনকে দান করার ফলে চীন ভেটো প্রয়োগ করে ভারতকে এই বিষয়টা সেখানে তুলতে দেয় না। □

কামদুনি মানে এখন শুধু বুকফাটা কান্না আর হাহাকার

কামদুনি মানে এখন শুধু বুকফাটা কান্না আর হাহাকার। সেই দিনের সেই পৈশাচিক কাণ্ড সারা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এখন রায়দানের পর শোকের ছায়া দেখছি হাইকোর্টে। কী নিদারুণ বুকফাটা কান্না। চোখে জল আনে। এই পত্র লিখতে ইচ্ছা করে না কিন্তু বিবেকের তাড়নায় লিখতে হচ্ছে। ২০১৩ সালের ৭ জুন দ্বিতীয় বর্ষের এক কলেজ পড়ুয়া কিশোরীকে কয়েকজন নরপশু ধর্ষণ করে খুন করেছিল। সেই বিচার চলতে চলতে এক দশক কেটে যায়। অবশেষে বিচার মেলে। তবে ওই মৃতা কিশোরীর পক্ষে নয়, বিচার পায় নরপশুরা। নিম্ন আদালত তিনজন নরপশুকে ফাঁসির সাজা এবং তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল। তারপর এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হয়। আপিলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দুজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয় আর চারজন ছাড়া পায়। হাইকোর্টের আদেশ ঠিক এই ভাবে দেওয়া হয়েছে : (১) আনসার আলি মোল্লার ফাঁসির পরিবর্তে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ। (২) সইফুল আলি মোল্লার ফাঁসির পরিবর্তে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ। (৩) আমিন আলির ফাঁসির সাজা হয়েছিল, পরে বেকসুর ছাড়া পেল। (৪) ইমানুল হক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে ছাড়া পেল। এইভাবে গুরু পাপে লঘু দণ্ড হয়। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পর এমন বিচারের রায়ে রাজ্যবাসীকে স্তম্ভিত করেছে। ওই মৃতা কিশোরীর পরিবার দুঃখ সাগরে ডুবে যায়। অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে কী ভয়ংকর হতে পারে তা ভেবে সেখানকার গ্রামবাসী ভয়ে আতঙ্কিত।

একদিকে বিলম্বিত বিচার, আইও-র রিপোর্ট, উকিলদের সওয়াল জবাব, ঘন ঘন সরকারি উকিল (১৪ জন) পরিবর্তন, ঠিক মতো সাক্ষী দিতে না পারা, একের পর এক আপিল— তারা বিচার পায় না। এমন জটিল পরিস্থিতিতে বিচার পাওয়ার কথা নয়। তাই 'প্রতিকারহীন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কেঁদে চলে। যারা এমন পৈশাচিক ঘটনার জন্যে দায়ী, কোর্টে প্রমাণ করে তারা নির্দোষ। আর যে নির্যাতিতা খুন হলো প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, সে ওই খুনিদের দ্বারা ধর্ষণ বা খুন হয়নি। সে কীভাবে খুন হলো? তার আইনি ব্যাখ্যা কোর্টের কাছে নেই। এটা তো অ্যাক্ট অব গড নয়, হিনাস অ্যাক্ট অব ক্রিমিনাল, আমরা সকলে তা জানি। এক কোর্টের আদেশ পক্ষে যায় আবার আপিল কোর্টের আদেশ বিপক্ষে যায়, ঠিক যেন জুয়া খেলার মতো। পাশার দান কখন কার পক্ষে যায় বোঝা মুশকিল। দশ বছর আগের ঘটনা দশ বছর পরে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কখনো সাক্ষী দেওয়া যায়? যা অবাস্তব তা কখনো বাস্তব হয়? তবুও এই বিলম্বিত, অন্ধকার বিচার ব্যবস্থা নাকি আমাদের মুক্তির ঠিকানা? বুলডোজার বাবা যোগীর এনকাউন্টারে মুহূর্তে বিচার মেলে বলে তাই এতো প্রশংসিত। আইন তৈরি হয় মানুষের মুক্তির জন্যে। এখানে আইন আমাদের মুক্তির দিশা দেখাতে পারছে না। ঔপনিবেশিক মানসিকতা, জরাজীর্ণ, সংস্কারহীন বিচার ব্যবস্থা, বিচার প্রক্রিয়ার অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

মনে হয় মানুষের জন্যে আইন নয়, আইনের জন্যে মানুষ। জটিল আইনের ফাঁদে পড়ে নীরীহ, অসহায়, গরিব, মূর্খ, দরিদ্র ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। বাঙ্গালিকে এই ভাবে হাইকোর্ট দেখানো হয় আর হাইকোর্ট থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বাড়ি যায়। বিচার ব্যবস্থাকে কখনো সমালোচনা করা যায় না কিন্তু কখনো কখনো তারা সমালোচিত হবার কারণ হয়ে ওঠে। কামদুনি এখন খুব করে কাঁদুক, কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুলোক ভোলার চেষ্টা করুক। এখন কোর্ট থেকে সুবিচার মিলবে এমন আশা ক্ষীণ মন হয়। ঈশ্বরের চরম অভিশাপ নেমে আসুক ওই খুনি ধর্ষকদের ওপর।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মুখোশের আড়ালে

সাধারণ পরিবারের কর্তা সবার মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য আমোদ প্রমোদ বর্জিত জীবনযাপন করেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সমাজের অন্য পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য দেখে নিজের বাড়ির কর্তার উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয় বটে। ঠিক তখন যদি অন্য কেউ সন্তানদের ভুল বোঝায়, তখন সংসার বাঁচাতে কর্তামশাই ওই ব্যক্তিকে তিরস্কার করে। এটাই দস্তুর। আমাদের দেশ ভারত ঠিক তেমনি একটি আস্ত পরিবার। নানা ভাষার, নানান পোশাক, নানান ধরনের খাদ্যের দেশ ভারত। সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে এই দেশ। বৈভবশালী হয়েও সাধারণ জীবনযাপন করে শিক্ষায় ও সাংস্কৃতিতে উন্নত ছিল আমাদের দেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে শিক্ষার জন্য আসতো পড়ুয়ারা। দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যায় উন্নত ছিল ভারতবর্ষ। ধর্মের বাঁধন ছিল। ছিল না চুরি। এল মধ্যপ্রাচ্য থেকে লুঠেরা। তারা সোমনাথ মন্দির থেকে লুণ্ঠন করে সোনার অলংকার। পুড়িয়ে দেয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। পুড়িয়ে দেয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। পুড়ে ছাই হয় অমূল্য পুঁথি। এরপর এল পাঠান, মুঘল। পিছিয়ে পড়ল সমাজ। নারী হলো অন্তঃপুরে বন্দি। বিধর্মীর লোলুপ নজর এড়াতে হলো গৃহবন্দি। বাণিজ্য করতে এলো ইংরেজ। পরে তারাই চক্রান্ত করে হয়ে গেল শাসক। আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে তারা নিয়ে গেল নিজের দেশে।

বহু রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেল দেশ। দেশ টুকরো হয়ে মুসলমানদের জন্য গঠিত হলো পাকিস্তান। মুসলমানরা থাকতে চায়নি হিন্দুদের সঙ্গে। ইংরেজ ও দুর্বল কংগ্রেসের জন্য ভাগ হয় ভারত। স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশ গড়ার বদলে কংগ্রেস নেতা-মন্ত্রীরা বিলাসিতা ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। বার বার নির্বাচন হলেও সরকার বদল হলেও দেশের জন্য ভাবনা তাদেরও ছিল না। দেশের ভিতর শত্রু তৈরি হলো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাশ্মীরের জেলে বন্দি

ফ ঃ ৩

দশায় মৃত্যু, প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয় রাশিয়ায়। জেনারেল সুব্রত মুখার্জির মৃত্যু, বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই ও হোমি ভাবার মৃত্যু হয় ওই একটা নির্দিষ্ট সময়ে। কোনো মৃত্যুর তদন্ত হয়নি। বলতে গেলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার হয়তো তদন্তের সাহস পায়নি। কারণ তখন আমাদের দেশের ভিতর বাসা বেঁধেছে বৈদেশিক শত্রুরা। তারাই কামিনী কাঞ্চন দিয়ে আমাদের দেশের প্রভাবশালী সরকারের আধিকারিক, নেতা মন্ত্রীদের কিনে নিয়েছিল। তারাই তলে তলে দেশ বিরোধী এজেন্ট নিয়োগ করে দেশকে ভিতর ভিতর খোকলা করে দেয়। বিশেষ করে ইউপিএ-১ ও ইউপিএ-২-এর সময় কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দলের রামধনু জোটের কারণে সরকারকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দেয়। সাহস দেখাতে পারেনি বিদেশি এজেন্টদের বিরুদ্ধে। নানাবিধ দুর্নীতিতে আকণ্ঠ জড়িয়ে পড়ে মনমোহন সিংহের সরকার।

এরপর ভারতের জনগণ দেশের দায়িত্ব তুলে দেন নরেন্দ্র মোদী সরকারের হাতে। বিরোধী দল সবসময় যে বর্তমান সরকারের উপর খড়্গহস্ত, নরেন্দ্র মোদীর সুশাসনের কারণেই দেশ বিরোধী বৈদেশিক শক্তির ভীষণ অসুবিধা হয়। তাই কংগ্রেস, বাম, অতি বাম, মমতা, লালু এক সুরে সরকারের বিরোধিতায় আওয়াজ তোলে। এরাই খালিস্তানিদের সমর্থক। ওই খালিস্তানিরা কৃষক আন্দোলনে মিশে গিয়ে লালকেল্লা থেকে দেশের পতাকা নামিয়ে খালিস্তানি পতাকা তুলে দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়েছে খালিস্তানি হাত রয়েছে মণিপুরের হিংসার মধ্যে। এনআইএ সেই তথ্য সামনে এনেছে।

এক শ্রেণীর সাংবাদিক নিউজ ক্লিক গঠন করে বিদেশি টাকা নিয়ে অরুণাচল ভারতের অংশ নয় তা প্রচার করছে দেশ ও দেশের বাইরে। এদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিলে কিছু রাজনৈতিক দল দেশের মধ্যে হইচই শুরু করে দেয়। মুখোশের আড়ালে থেকে এরা সবাই মিলে দেশের সর্বনাশ চাইছে। আর দেশের বর্তমান কর্তা নরেন্দ্র মোদী সমান তালে ঘরে-বাইরে লড়াই করে চলেছেন।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

কামদুনির মেয়ে সুবিচার পেলো না

২০১৩ সালের ৭ জুন কলকাতা থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের কামদুনির মাত্র ২০ বছরের মেয়ে শিপ্রা ঘোষ, ডিরোজিও কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপহৃত হয়। সাত-আটজন মিলে একটা ফাঁকা কারখানায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে ও নৃশংস ভাবে খুন করে। পরেরদিন থেকে গোটা কামদুনি-সহ আশেপাশের এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদে নামেন। প্রতিবাদের তীব্রতা এতো বেশি ছিল সেনাবাহিনী নামাতে হয়। এই কামদুনির নিরীহ মেয়েটির নৃশংস হত্যা পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশের রাজনীতি তোলপাড় হয়। যদিও শাসকদল গোটা ঘটনাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

এই নিয়ে প্রতিবাদ আর নিন্দার ঝড় ওঠে। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি ও ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ চলতে থাকে। পুলিশ মূল অভিযুক্ত আনসার আলি-সহ ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে। এই রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওখানে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করে চাকরি, ক্ষতিপূরণ-সহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন। এমনকী গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেন ১৫ দিনের মধ্যে চার্জ গঠন হবে এবং একমাসের মধ্যে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার দোষীদের ফাঁসি চাইবেন। সেদিন কিন্তু কামদুনি-সহ গোটা রাজ্যের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের অধীনে সিআইডি-কে এই ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল। পরিবারও আশায় বুক বেঁধে ছিল। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে বারাসতের লোয়ার আদালত ছ'জনকে দোষী সাব্যস্ত করে। তিনজনের ফাঁসি ও তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেন। কিন্তু অভিযুক্তরা এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যায়।

এক্ষেত্রে যারা তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করেছিলেন প্রথম দিকে লোয়ার কোর্টে দাখিল হয়েছিল। লোয়ার কোর্টে কেসটির যথাযথ বিচার হয়েছিল ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে। মূল অভিযুক্ত-সহ তিনজনের ফাঁসি ও জিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্তরা লোয়ার কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যায়। দীর্ঘ সাত বছর ধরে মামলা চলে। তথ্য সাক্ষ্য প্রমাণ যখন টাকায় বিক্রি হয় তখন সুবিচার পাওয়া খুব মুশকিল। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে অসহায় মানুষের বিপক্ষে রায় দিয়ে।

এই ঘটনার প্রধান সাক্ষীকে খুন হতে হয়। সিআইডি তথ্য, প্রমাণ, সাক্ষ্য সবকিছুই হাইকোর্টে লঘু করে দেখাতে থাকে। সরকারি উকিল ১৪ বার পরিবর্তন করা হয়। ফলে যা হওয়ার তাই হলো, আদালতে উপযুক্ত সাক্ষ্য, প্রমাণ অভাবে ফাঁসির আদেশ বাতিল হলো। আনসার আলি-সহ দুজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়েছে বাকি অভিযুক্তরা জামিনে ছাড়া পাচ্ছে। আর এখানেই নতুন করে কামদুনির ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদীদের ক্ষোভ জমা বেঁধেছে। টুম্পা, মৌসুমী-সহ যে নারীশক্তি সেদিন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিল। আজও তারা আবার সুবিচারের জন্য রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন। এই রায় শুনে মেয়েটির পরিবারের লোকজন হতাশ ও আতঙ্কিত। কারণ পুলিশ ও সিআইডি-র অদক্ষতার জন্য আজ অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন। আবার তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন নতুন কোনো মেয়ের সর্বনাশ করতে। গোটা পশ্চিমবঙ্গের এইসব নরপিশাচ যারা আছে তাদের উৎসাহ বাড়বে এই ধরনের অপরাধ করতে। আসলেই এই ঘটনার রায় হাইকোর্টে সরকার পক্ষের আইনজীবী দোষীদের বিরুদ্ধে না গিয়ে একপ্রকার শাসকদলের ভোটব্যাংক বাঁচাতে সংখ্যালঘু অভিযুক্তদের সঙ্গে আপোশ করছেন।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
গরবেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

এগিয়ে চলাই জীবন

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের জীবনশৈলীতে মায়ের প্রভাব সর্বজনবিদিত। জন্ম থেকেই মাতৃনাম নিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা শুরু হয়। সর্বক্ষণ এই মাতৃনামই আমাদের কাণ্ডারি। মা, ওমা, মাগো— অহরহ এই নামই জপে চলেছি। ভারতে বৃদ্ধা বর্ষীয়সী মহিলারা সমাজে সর্বাধিক সম্মানিত। যুগের পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে। এখন আমরা বয়স্কা মহিলাদের সংসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে দেখতে পাই। আশ্চর্য মনে হলেও তাঁদের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। এই মাতৃস্থানীয়াদের নিরন্তর এগিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।

লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীমতী আশা সিংহ। তিনি তাঁর নাতির সঙ্গে দৌড়াতেন। সারাজীবন গৃহবধূরূপে তিনি সন্তানদের বড়ো করেছেন, সংসার সামলেছেন। ২০১৬ সালে তাঁর বয়স যখন সাতান্ন বছর, তখন তাঁর ছেলের এক বন্ধু তাঁকে পুনের একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বলে। মাত্র সত্তর মিনিটে তিনি দশ কিলোমিটার অতিক্রম করেন। এরপর থেকে তিনি দেশে-বিদেশে ৪৫টিরও বেশি ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌতে ১০০ কিলোমিটার দৌড় এবং ২০২১ সালে দিল্লিতে ১৮০ কিলোমিটার আলট্রা ম্যারাথন সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য উৎসাহদাতা ও প্রশিক্ষক হলেন তাঁর স্বামী কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) বজরঙ্গ সিংহ।

রবিবালা শর্মা

আশা সিংহ

ভারতী পাঠক

মুম্বই নিবাসী শ্রীমতী ভারতী পাঠক জীবনে অনেকটা পথ চলার পরে দেখলেন যে, দৌড়ানো তাঁর একটি ভালোলাগার বিষয়। আশি বছর বয়স্কা এই মহিলা এখনও পর্যন্ত পাঁচটি ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি হাঁটা ও দৌড়ানো এই দুইরকম প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এর শ্রেয় তিনি দিয়েছেন তাঁর সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন পদ্ধতিকে। দিনে দু'বার খাবার খান। সাধারণত খিচুড়ি অথবা রুটি-তরকারি। বাড়ির সব কাজ নিজে হাতেই করেন। রাত্রি সাড়ে ন'টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। মহিলাদের জন্য তাঁর উপদেশ হলো— দিনে অন্তত আধঘণ্টা ব্যায়াম করা, হালকা খাবার খাওয়া এবং নিজের কাজ নিজে করা। এই অনুশাসনে নিজেকে বাঁধতে পারলে শরীর মন দুই-ই ভালো থাকে।

শ্রীমতী বৃন্দা রামানান আঠারো বছর বয়স থেকে পাহাড় ভালোবাসেন। সংসার, সন্তান, নিজের নাচের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সময় পেলেই পাহাড়ে ট্রেক করতে বেরিয়ে পড়েন। তিন মাসের বেশি সময় তিনি পাহাড় থেকে দূরে থাকতে পারেন না। এই তেষট্টি বছরের মহিলা প্রতি বছর পনেরো-কুড়িজন বাচ্চা হিমালয়ে নিয়ে যান। স্বামীর সঙ্গে পাহাড়ের বিষয়ে দুটি বইও লিখেছেন। গাড়োয়াল পর্বতমালার ২০,৪০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় তিনি উঠেছেন এবং এখনও সক্রিয়। তাঁর জীবনশৈলীতেও বেশি রাত-জাগা অথবা ফাস্টফুডের খাবারের কোনো স্থান নেই। এছাড়া তিনি একজন ভরতনাট্যম নৃত্যাঙ্গনা। নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য তিনি নিয়মিত হাঁটেন, সাইকেল চালান এবং যোগাভ্যাস করেন।

চৌষট্টি বর্ষীয়া শ্রীমতী রবিবালা শর্মা বাল্যকাল থেকেই শাস্ত্রীয় নৃত্যাভ্যাস করতেন। দিল্লির সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি তবলা, সেতার ও ভারতীয় সংগীত শিক্ষা দিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি মুম্বইতে ছেলের কাছে থাকতে শুরু করেন। করোনাকালে তাঁর একটি নাচের ভিডিয়ো খুবই জনপ্রিয় হয়। টিভি চ্যানেলগুলিও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সাংসারিক দায়-দায়িত্বের সঙ্গে বর্তমানে তিনি বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে কত্থক ও অন্যান্য পারম্পরিক নৃত্য প্রস্তুত করে চলেছেন। জীবনের প্রতি আশাবাদী শ্রীমতী রবিবালা শর্মার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

এই মহিলারা সকলেই বয়স্কা। এই বয়সে অনেকেই নিজেকে গুটিয়ে নেন, কিন্তু এঁরা এগিয়ে চলেছেন। আমরাও তাঁদের থেকে জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করার শিক্ষা নেব, কারণ এগিয়ে যাওয়াই জীবন। চরৈবেতি, চরৈবেতি...। □

ব্রণর সমস্যা ও প্রতিকার

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ত্বকের তেলগ্রন্থিতে প্রোপাইনো ব্যাকটেরিয়াম অ্যাকনে নামক জীবাণুর সংক্রমণে ব্রণ হয়। ব্রণ সাধারণত মুখে, কাঁধে, গলায় ও পিঠে হয়। ব্রণ ছোটো, বড়ো, কালচে এবং পুঁজওয়ালা হতে পারে। ব্রণ হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে শরীরে হরমোনের তারতম্য হওয়া। সাধারণত কিশোর এবং তরুণ বয়সে ব্রণ বেশি হয়। ৮০ শতাংশ কিশোর বা তরুণ ব্রণ সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে।

পুরুষ হরমোন অর্থাৎ অ্যানড্রোজেন ত্বকের তৈলগ্রন্থিকে অতি সক্রিয় করে তোলে। এতে করে ত্বকের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ব্যাকটেরিয়া সংক্রামিত হয় ও ব্রণ সৃষ্টি হয়। প্রতি স্কোয়ার সেন্টিমিটার মুখের ত্বকে ৪০০-৯০০ সেবাম বা তৈলগ্রন্থি থাকে অথচ অন্য জায়গায় ত্বকে ১০০ গ্রন্থি থাকে। ব্রণ হওয়ার আগেই প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। কারণ ব্রণের কারণে মুখের ত্বকে দাগ এবং ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। এতে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণ বেশি হয়। তাই যাদের ত্বক তৈলাক্ত তাদের সাবধান থাকা প্রয়োজন।

ব্রণ প্রতিরোধে প্রতিদিন ত্বকের যত্ন

প্রতিদিন ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করবেন। হালকা ধরনের ক্লিনজার দিয়ে দিনে তিনবার মুখ ধোবেন। মুখ ধোয়ার সময় হালকা গরম জল ব্যবহার করবেন এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই মুখ ধোবেন। ত্বক খুব বেশি শুষ্ক হয় এমন সাবান বা ক্লিনজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। ত্বকে সপ্তাহে একদিন স্টিম ট্রিটমেন্ট করবেন। অর্থাৎ ৫ মিনিট গরম জলের ভাপ নেবেন। এতে করে ত্বকের উপরিভাগের মরা কোষ সরে যায় এবং তেলগ্রন্থির মুখগুলোয় জমা তেল পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে ব্রণ হয়ে যাওয়ার পর বাষ্প বা ভাপ না নেওয়াই ভালো। ব্রণ খুঁটবেন না বা বারবার হাত দেবেন না। এতে করে সংক্রমণ বাড়তে পারে এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়। যথাসম্ভব কম প্রসাধনী ব্যবহার করবেন। সুষম খাবার খাবেন। প্রতিদিন ২ বাটি সবজি খাবেন। তিনবার ফল খাবেন এবং ২ গ্লাস ফ্যাট ফ্রি দুধ বা দই খাবেন। নিয়মিত শরীরচর্চা করবেন। এতে করে হরমোনের তারতম্যজনিত সমস্যা কমে যায় এবং ত্বক সুন্দর হয়।

ব্রণের চিকিৎসা

• বেনজাইল পারঅক্সাইড জেল

প্রায় তিরিশ বছর ধরে বেনজাইল পারঅক্সাইড ব্রণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতি রাতে ২.৫ শতাংশ বেনজাইল পারঅক্সাইড জেল ব্যবহার করতে হয়। এভাবে এক মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। যদি ত্বক শুষ্ক না হয়ে ওঠে তবে ৫ শতাংশ বেনজাইল পারঅক্সাইড ব্যবহার করা যায়।

• অ্যান্টিবায়োটিক জেল

ক্লিনডামাইসিন এবং এরিথ্রোমাইসিন জেল যথেষ্ট উপকারী। দিনে বেনজাইল পারঅক্সাইড জেল ও রাতে অ্যান্টিবায়োটিক জেল ব্যবহার করা যেতে পারে। পুঁজযুক্ত ব্রণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম খুব উপকারী।

• এজিলেইক অ্যাসিড

আন্তর্জাতিক ভাবে গত ১৫ বছর ধরে এজিলেইক অ্যাসিড ব্যবহার হলেও আমাদের দেশে এর ব্যবহার নতুন। এজিলেইক অ্যাসিডও অ্যান্টিবায়োটিক। দিনে দু'বার ব্যবহার করতে হয়।

• ট্রিটিনোইন

ট্রিটিনইন ক্রিম ব্রণের চিকিৎসায় খুব ভালো। তবে অবশ্যই ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ট্রিটিনোইন ব্যবহার করবেন।

• অ্যান্টিবায়োটিক

২ থেকে ৩ মাস চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হতে পারে ব্রণ চিকিৎসার জন্য। টেট্রাসাইক্লিন বা এরিথ্রোমাইসিন এক্ষেত্রে খেতে দেওয়া হয়।

আইসোট্রিটিনোইন— ভিটামিন এ থেকে প্রাপ্ত উপাদান আইসোট্রিটিনোইন, অসাধারণভাবে কার্যকরী।

হরমোন পিল

হরমোনের তারতম্যের জন্য ব্রণ হয় বলে হরমোন পিল দিয়েও ব্রণের চিকিৎসা করা হয়। পলিসিসটিক ওভারিয়ান ডিসঅর্ডারের জন্য ব্রণ হলে হরমোন পিল কিংবা পরিবার-পরিকল্পনার জন্য যে পিল ব্যবহার হয় তা দেওয়া হয়। তবে রক্তে হরমোনের পরিবর্তন বা তারতম্য দেখে পিল খেতে দেওয়া হয়।

ব্রণের নানারকম কার্যকর চিকিৎসা আছে, কিন্তু ব্রণের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি। ধৈর্য ধরে ব্রণের চিকিৎসা নিতে হবে। আর ব্রণ অবহেলা না করাই ভালো। কেননা ব্রণের কারণে ত্বকে ক্ষত ও দাগ সৃষ্টি হতে পারে। ব্রণের চিকিৎসা নিজের ইচ্ছামতো কখনোই করবেন না। বিজ্ঞাপনে প্রচারিত কোনো পণ্য ব্যবহার করবেন না। অবশ্যই ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্রণের চিকিৎসা নেবেন।

ব্রণ সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

• ব্রণ আপনাআপনি ভলো হয়ে যাবে, চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

• প্রচুর তৈলাক্ত খাবার কারণে ব্রণ হয়।

• চকলেট ও পনির খেলে ব্রণ হয়।

• ত্বক শুষ্ক করে এমন সাবান দিয়ে দিনে কয়েকবার মুখ পরিষ্কার করলে ব্রণ হয় না। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □

ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজ-সংস্কারে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

নিতাই নাগ

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। পুণ্যভূমি ভারতে বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। ধর্মের গ্লানিতে কলুষতা নাশ করতে স্বয়ং ভগবান এদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন। সনাতন-ধর্মের আবিলতায় ধর্মসংস্কারে এসেছেন ভারতমাতার শক্তিমান সন্তানেরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। আধুনিক ভারতে বিদেশি ব্রিটিশ- রাজত্বে সনাতন হিন্দুধর্মে সংস্কারসাধন ও বেদভিত্তিক নবধর্ম প্রচার তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

দয়ানন্দ স্বামীর জন্ম ১৮২৪ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি গুজরাটে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে মোরভি জেলার এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর প্রকৃত নাম মূলশঙ্কর কর্ষণদাস তিওয়ারি। তাঁর পিতা সরকারি রেভিনিউ কালেক্টরের চাকরি করতেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা পিতার কাছে। সংস্কৃতভাষা উত্তমভাবে আয়ত্ত করেন। আট বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। এসময়ে ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন এবং বেদ-মন্ত্র মুখস্থ ছিল তাঁর। তিনি ইংরেজি-শিক্ষার সুযোগ পাননি।

তাঁর পিতা শিবভক্ত ছিলেন। পিতার উপদেশমতো প্রত্যহ তিনি শিবলিঙ্গের পূজার্চনা করতেন। শিবরাত্রির সময় ব্রত ও উপবাস করতেন। এই শিবপূজাকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনে এক দারুণ পরিবর্তন আসে। শিবরাত্রির দিনে রাত্রে চার-প্রহরে শিবপূজা, উপবাস ও জাগরণে কাটাতে হয়। রাত্রে দু'প্রহরের পূজার পর মন্দিরের পুরোহিত ও তাঁর পিতা ঘুমিয়ে পড়লেও দয়ানন্দ জেগে থাকেন এই বিশ্বাসে যে অভীষ্টফল পাওয়া যাবে। কিন্তু একটি ঘটনায় তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। গর্ত থেকে ইঁদুরকে বেরিয়ে এসে শিবলিঙ্গের গায়ে-মাথায় চড়ে নিবেদিতবস্তু খেতে দেখেন তিনি। পিতাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, সর্বশক্তিমান মহাদেব কেন সামান্য ইঁদুরকে ফেলে দিতে পারছেন না নিজের শরীর থেকে। পিতা সদুত্তর দিতে পারেননি। তারপর থেকে তাঁর মূর্তিপূজার প্রতি বিশ্বাস টলে যায়, আর শিবপূজা করবেন না বলে ঠিক করেন।

ষোলো বছর বয়সে তিনি পরিবারের নিকটজন ঠাকুরদা ও কাকাকে হারান। তাঁর থেকে বয়সে দু' বছরের ছোটো বোনের কলেরায় হঠাৎ মৃত্যু ঘটতে দেখেন। মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনায় তাঁর মনে জীবনের অনিত্যতাবোধ জাগে। পিতা পুত্রের বৈরাগ্যভাব দেখে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলে ১৮৪৬ সালে বাইশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। পদব্রজে (১৮৪৬-১৮৬০) প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি হিমালয়ের নানাস্থানে ও নর্মদার অরণ্যসংকুল অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন।

জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি নর্মদা-তীরে চানোদে পরমানন্দ সরস্বতীর কাছে বেদান্ত-সার ও বেদান্ত-পরিভাষা ইত্যাদি শিক্ষাগ্রহণ করেন। আমেদাবাদের কাছে জ্বালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরি নামে দুই সাধুর কাছে যোগবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করেন। এসময়ে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করলে তাঁর নাম হয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। ১৮৬০ সালে মথুরাতে বিরজানন্দ দণ্ডিতের কাছে ৬/৭ বছরে বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি অধ্যয়নের পর হয় তাঁর প্রকৃত শিক্ষা। তাঁর গুরু বিরজানন্দ তাঁকে আদেশ দেন দণ্ডি আর্যাবর্তে বেদের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে এবং বৈদিক-ধর্মসংস্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে। এরপর থেকে তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী হয়ে ওঠেন। বৈদিকধর্ম ও আচার-আচরণ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ধর্মের বাহ্যিক আবরণ ভস্মলেপন, তিলকধারণ, রুদ্রাক্ষ ধারণ মালা-পরা অনুচিত বলে প্রচার করতে থাকেন। ১৮৬৯ সালে তিনি নিজমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের ক্ষেত্র জ্ঞানপীঠ কাশীতে আসেন। কাশী নরেশের সভাপতিত্বে বিচারসভায় মূর্তিপূজা যে বেদবিরুদ্ধ তিনি তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করার সুযোগ পাননি। কারণ পণ্ডিতরা সভায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। তাঁর মতবাদ যে ভুল তা তাঁরাও তুলে ধরতে পারেননি। তবে তাঁর জয়যাত্রা থামাতে পারেননি।

যাহোক, এরপর তিনি হিন্দুধর্মকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপনের জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালান।

দয়ানন্দ সরস্বতী প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। সেসময় বহুলোক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল। এর আগে হিন্দু থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে বহু ভারতীয়। তিনি এসব ধর্মান্তরিত মানুষদের সনাতন বৈদিকধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য শুদ্ধি-আন্দোলন শুরু করেন। তিনি বলতেন বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা জন্মসূত্রে নয়, চারিত্রিক গুণের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ জন্মগতভাবে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না; নিজ-চারিত্রিক সদ্‌গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয়। তিনি স্ত্রী-পুরুষ সকলকে গায়ত্রী মন্ত্রদানের অধিকারী করেন। বেদভিত্তিক-শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি দেশের নানাস্থানে গুরুকুল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেদকে অবলম্বন করে অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্নে তিনি ১৮৭৫ সালে বোম্বেতে প্রথম 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রচনা করেন— 'ঋগ্বেদ ভাষ্য', 'সত্যার্থ প্রকাশ', 'সংস্কার বিধি' ইত্যাদি গ্রন্থ। শ্রীঅরবিন্দের তাঁর বেদভাষ্য সম্পর্কে মন্তব্য স্মরণযোগ্য--- 'অন্তে যে ভাষ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হউক না কেন স্বামী দয়ানন্দই সর্বাগ্রে পূজিত হইবেন, কারণ তিনিই ভাষ্যের প্রকৃতরহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশৃঙ্খলা, অবিদ্যা, অন্ধকার ও বহু শতাব্দীর ভ্রমজালে জনতা আবদ্ধ ছিল। তাঁহার দৃষ্টিই ইহা অতিক্রম করে সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিল।'

তাঁর আর্যসমাজ ক্রমশ লাহোর, মূলতান, মিরাট, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বামী দয়ানন্দের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন মাদাম কামা, শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা, ভগৎ সিংহ, সাভারকর, তিলক, লালা হরদয়াল, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর মৌলিক চিন্তা ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে প্রভাবিত করেছিল।

ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর আর্যসমাজের অগ্রগতির কাজে প্রধান বাধা ছিল গোঁড়া হিন্দুসমাজ, কট্টরপন্থী মুসলমান ও খ্রিস্টানরা। হিন্দুসমাজের পুরোহিততন্ত্রের অনুগামীরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলী মেনে নিতে পারেনি। ধর্মান্তরিতদের হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর শুদ্ধি-আন্দোলন মুসলমান ও খ্রিস্টানদের অসন্তুষ্ট করেছিল। অথচ ভারতের ধর্ম বেদভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও অবৈদিক আচরণ দূর করতে তাঁর 'Back to the Vedas' স্লোগান ছিল যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে D. Pande-এর লেখা 'The Arya Samaj and Indian Nationalism' গ্রন্থের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— '...it can be considered that the Arya Samaj laid the foundation of nationalism. It was Swami Dayananda, who through his militant approach, made Indians realise that they were heirs of splendid heritage.' তাঁর সম্বন্ধে পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত পায় বলেছেন— 'স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আমার গুরু, আমার ধর্মপিতা এবং আর্যসমাজ আমার ধর্মমাতা।'

তাঁর সম্পর্কে গান্ধীজীর সশ্রদ্ধ উক্তি হলো— 'তিনি (দয়ানন্দ) আধুনিক ভারতের ঋষি, সংস্কারক ও মহাপুরুষদের মধ্যে অন্যতম।' আবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন--- 'যাঁহার দৃষ্টি ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে একতা ও সত্যের সন্ধান পাইয়াছিল, যাঁহার আহ্বান ও বাণী ভারতকে অবিদ্যা, আলস্য ও ভ্রমজাল হইতে মুক্ত করিয়া সত্য ও পবিত্রতায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং অতীত গৌরবকে উজ্জ্বলতা দিয়াছিল সেই মহানগুরু স্বামী দয়ানন্দকে আমি প্রণাম করি।'

১৮৭২ সালে দয়ানন্দ স্বামী নিজ মত প্রচারের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কেশব সেনের অনুরোধে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দিতে বেদব্যাখ্যা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বাগানে দেখেছিলেন এবং এ-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য কথামৃতে এরূপ উল্লিখিত— 'দেখতে গিছলুম, তখন ও ধারে একটি বাগানে ছিল। ...খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বলতো, গৌড়াণ্ড ভাষা। ইনি বুঝি হোম আর দেবতা মানতেন না, নিরাকারবাদী।'

রাজস্থানে রাজপুত রাজাদের মধ্যে স্বদেশী চেতনা জাগ্রত করার কাজে রত থাকার সময় যোধপুরে তাঁর প্রতি ঈর্ষাবশত তাঁকে দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে পান করানো হয়। ১৮৮৩ সালে ৩০ অক্টোবর আজমীঢ়ে মন্ত্রজপ করতে করতে দেহত্যাগ করেন।

তথ্যসূত্র :

১। প্রবাসী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ সংখ্যা।

২। The Arya Samaj and Indian Nationalism (1875-1920)---Dhanpati Pande, S. Chand & Co. New Delhi-55, (p-191)

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত— শ্রীম, আনন্দ পাবলিশার্স।

৪। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সাধক ও সাধিকা— নন্দলাল ভট্টাচার্য গ্রন্থনা, কলি-৯, ১৯৮৭।

(শারদীয়া বিশ্ববাণীর সৌজন্যে)

সনাতন ভারতের নবোত্থানের দিশারি—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

যদি প্রশ্ন করা যায়, ভগৎ সিংহ, বীর সাভারকর, মদনলাল ধিংড়া, রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, লালা লাজপত রায়, এই নামগুলির মধ্যে মিল কোথায়? উত্তর— এদের মধ্যে মিল একটাই, এঁরা সকলে ভারতভক্ত, বীর বিপ্লবী। তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখার মতো— তা হলো এঁরা সকলেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নামে এক মহান মহর্ষির অনুপ্রেরণার সুতোয় গাঁথা মালা। এরা সেই মহান মনীষীর মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে শুরু করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করার মরণপণ সংগ্রাম, এরা সবাই ছিলেন মহর্ষির ভাবশিষ্য।

আজ থেকে ২০০ বছর আগে (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪) মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর যখন জন্ম তখন দেশ বহু বছরের পরাধীনতায় নির্জীব, দুর্বল হয়ে তার নিজের আভা, তেজ, আত্মবিশ্বাস সব হারিয়ে ফেলে ছিল। তারপর প্রতিক্ষণে আমাদের সংস্কার, আদর্শ, জীবন মূল্যকে ধ্বংস করার বিদেশি চক্রান্ত চলছিল। ভারতবর্ষ হীন-দুর্বল- কুসংস্কারের একটি অন্ধকারময় দেশ বলে বিশ্বের কাছে প্রচার করা হচ্ছিল। যখন কোনো সমাজে পরাধীনতার হীন ভাবনা মনে দৃঢ়ভাবে বসে যায় তখন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ গুণগুলির স্থানে আড়ম্বর ও আচার সর্বস্বতা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ঠিক এমনই ক্ষণে, জাতির সেই সংকটজনক মুহূর্তে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর উদয়। তিনি বেদের বোধকে সমাজে পুনর্জীবিত করেছিলেন। যুক্তি দিয়ে সিদ্ধ করেছিলেন— ভারতের ধর্ম পরম্পরায় কোনো খামতি নেই। খামতি হলো আমরা আর্যধর্মের বাস্তবিক স্বরূপ ভুলে

গেছি। পৃথিবীর এই আদি ধর্মে বিকৃতি ভরে গেছে। ভারতকে পুনরায় আর্যধর্মের বিশ্বকেও 'আর্য' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৭৫ সালের ১০ এপ্রিল মুম্বইতে প্রতিষ্ঠা করলেন 'আর্য সমাজ'। মন্ত্র হলো— 'কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্যম্'— লক্ষ্য সমগ্র মানব জাতিকে বৈদিক আলোয় উদ্ভাসিত করা।

এমন এক মহান বিভূতির জীবন কাহিনি ভারতের ইতিহাসে প্রায় উপেক্ষিত কিন্তু কেন? বাল্যকাল থেকে আমাদের ইতিহাসে পড়ানো হয়েছে পাঠান মুঘলের ভারতজয়ের কাহিনি, আলেকজান্ডার, মামুদ, ঘোরি, তৈমুর, বাবরদের বংশপরম্পরার কষ্টকল্পিত বীরত্বের কথা, পর্তুগিজ ও ইংরেজ শাসকের মহান ইতিবৃত্তের গল্প, পড়ানো হয়েছে রোম-মিশর-ব্যবিলন-রাশিয়ার সাম্রাজ্যের কীর্তি। শুধু পড়ানো হয়নি আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের বীরপুত্রদের বীরত্বের ইতিহাস। মহান কন্যাদের দুর্দমনীয় শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্বের কথা। পড়ানো হয়নি এদেশের জগৎশ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের অবদানের কথা। জানানো হয়নি এদেশের মহান ঋষি পরম্পরা, সন্ন্যাসীকুলের বিশ্বকে জ্ঞান গরিমা বিতরণের গর্বের ইতিহাস। তাই এদেশে দয়ানন্দজীর মতো এমন এক যুগপুরুষ মহামানবও আমাদের কাছে উপেক্ষিত থেকে গেছেন।

নিদ্রিত জাতিকে যিনি বজ্রকণ্ঠে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'হে আর্যাবর্ত, ওঠো, জাগো, সময় এসেছে নতুন যুগে প্রবেশ করো। এই পৃথিবীকে তোমার শ্রেষ্ঠ দান করো, তুমিও পৃথিবীর কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ দান ফেরত পাবে'--- তিনি ছিলেন ভারতের ঋষি পরম্পরায় জন্ম নেওয়া মূলশঙ্কর তেওয়ারি, যিনি পরবর্তীকালে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হন। একাধারে তিনি ছিলেন দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, হিন্দু ধর্মের সংরক্ষক ও প্রচারক, অন্য ধারে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎসস্থল। যে সময় বিদেশি শাসক নিজেদের ভাণ্ডার ভরার জন্য ভারতের সম্পদ, অস্মিতা ও গৌরবকে দিনরাত লুঠ করছিল, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করার উচ্চকণ্ঠ তখনও গর্জে ওঠেনি--- এমনই সময়ে তাঁর আবির্ভাব। ইংরেজ বুঝেছিল ভারতবর্ষে আস্থা, জ্ঞান ও স্বাভিমানের শেকড় কত গভীরে। তাই এদেশের সংস্কৃতির শেকড় কেটে না ফেললে এই বিশাল আর্যধর্মের বটবৃক্ষকে মারা যাবে না। ভারতবর্ষকে বেশিদিন শাসনও করা যাবে না। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্ মেকলের বক্তব্য ছিল--- 'ভারতীয়দের মনে হীন ভাবনা ভরে দিতে হবে। তাদের মনে এই বিশ্বাস জাগাতে হবে যে ওদের সংস্কৃতি পিছিয়ে পড়া সংস্কৃতি। ওদের পরম্পরা, ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। এমনকী ওদের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা— সব নিকৃষ্ট। ওদের উন্নত হতে গেলে ইংরেজদের পথে চলতে হবে, ইংরেজদের থেকে শিখতে হবে। তাদের নিজেদের

মা-বাবা বলে মনে করতে হবে।

এদেশে এমন একদল ইংরেজ ভক্ত তৈরি করতে হবে যারা দেখতে তো ভারতীয়দের মতো হবে কিন্তু চিন্তনে মননে হবে ইংরেজ। দাস মানসিকতায় এদের যুগ যুগ ধরে ইংরেজদের গোলাম বানিয়ে রাখলে তবেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যাবে না।' তারা আমাদের শেখালো ভারতে আর্যরা হলো 'বহিরাগত'। এবং এদেশের জনজাতি, উপজাতি সমাজ হলো 'আদিবাসী'--- এরা আর্য নয়, অনার্য। এদেশের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সনাতন আর্য জাতিকে আদিবাসী ও বহিরাগত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে এদেশে চিরস্থায়ী শাসনের চক্রান্ত করেছিল।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী লাল চামড়ার এই শয়তানি চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেলেন। প্রাচীন পুঁথি ও ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটে সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিলেন এদেশের কোনো অধিবাসীই বহিরাগত নয়, সকলেই আর্য, শ্রেষ্ঠ, সনাতনী, হিন্দু। তিনি সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে চলে আসা সনাতন জাতিতে ঠাঁই নেওয়া কিছু কুরীতি, আচার সর্বস্বতা, সামাজিক ভেদভাব, ছোঁয়াছুতের বিরুদ্ধে এক সশক্ত অভিযান চালিয়েছিলেন। যেসব কুরীতির ধর্মের অঙ্গ বলে প্রচার করে হিন্দুধর্মের সমালোচনা চলছিল দয়ানন্দজী যেসব কুরীতি ধর্মের প্রকাশের মাধ্যমেই নিরসন করার পথ প্রদর্শন করেছিলেন। পশ্চিমি দেশগুলিতে যখন মহিলাদের অধিকার তো দূরের কথা মানুষ বলে জ্ঞানই কর হতো না, তখন তিনি নারীশিক্ষার জন্য নতুন করে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। দেখিয়েছিলেন প্রাচীন বৈদিক যুগে নারী এদেশে কেমন মহত্ত্বের আসনে আসীন ছিল।

বর্হিবিশ্ব ধর্ম মানে বোঝায় পূজাপাঠ, উপাসনা পদ্ধতি, আস্থা ও রীতিনীতি কিন্তু এদেশে ধর্ম মানে বোঝায় এক সম্পূর্ণ জীবন পদ্ধতি, কর্তব্য বোধ। সেই কর্তব্যের নাম পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, পুত্রধর্ম, দেশধর্ম,কালধর্ম। স্বামী দয়ানন্দজী বেদের সেই মহত্তর ধর্ম-দর্শনকে আমাদের সামনে পুনরায় উদ্ভাসিত করেছিলেন। প্রমাণ করেছিলেন এদেশে সন্ত ঋষিদের ভূমিকা কেবল পূজা-উপাসনা পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং তাঁরা এই সমাজে বসবাসকারী মানবসমূহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার নিজের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ শেখায়।

দয়ানন্দজী শুধু ধর্ম সংস্কারকই ছিলেন না, ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। তিনিই প্রথম এদেশে 'স্বরাজ'-এর দাবি তুলেছিলেন। যা পরে বালগঙ্গাধর তিলক মন্ত্ররূপে সারা দেশে প্রচার করেছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, 'স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।' তিনিই ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পনাকার। সেই মহাসংগ্রামের ক'বছর আগে বিহারের বিপ্লবী বাবু কুঁয়োর সিংহ শঙ্কা ভরা মনে দয়ানন্দজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্বামীজী, আমরা কি এই বিপ্লবে সফল হতে পারব?' দয়ানন্দজী মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন কুয়োঁর, ভারত এক হাজার বছর ধরে পরাধীন হয়েছে, একে স্বাধীন করতে প্রায় তত দিনই লাগবে।' 'তবে আমাদের এই আন্দোলনের কী হবে? এত প্রাণের আহুতি কি ব্যর্থ হবে?' দয়ানন্দজী বললেন, 'স্বাধীনতা সস্তায় পাওয়ার জিনিস নয়। বছর বছর ধরে অসংখ্য প্রাণের আহুতি দিতে হবে, সংঘর্ষের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। আমরা কেবল এই কাজে শুরু করেছি মাত্র।'

স্বামী দয়ানন্দজী জানতেন ১৮৫৭ সালে আমরা বিজয়ী হতে পারব না। কিন্তু এর মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শঙ্খনাদ শুরু হয়ে। ভারতীয়দের বুকের মাঝে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠবে। ধরিত্রী কেঁপে উঠবে। সাহেবের ছাতিতে লাগা বিপ্লবীদের ছোঁড়াগুলি মহারানি ভিক্টোরিয়ার মনে ভয় জাগাবে। তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীই পরে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

একবার দয়ানন্দজীর সঙ্গে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল নর্থব্রুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ক্ষমতার দম্ভে মত্ত গভর্নর তাঁকে বলেছিলেন— আপনি আপনার বক্তব্যের শুরুতে ঈশ্বরের যে স্তুতি করেন, তাতে কি এই প্রার্থনাও করেন যে ইংরেজ সরকারের কল্যাণ হোক?' দয়ানন্দজী মৃদু হেসে বলেছিলেন— ইংরেজ সরকারের জন্য প্রার্থনা তো করি, কিন্তু সেই প্রার্থনা হলো এদেশে যত তাড়াতাড়ি ইংরেজ রাজত্বের সর্বনাশ হয়, আর আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আসে। শুনে গভর্নর সাহেবের দু'কান লাল হয়ে উঠেছিল। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এক চালচুলোহীন হিন্দু সন্ন্যাসীর হৃদয় কীভাবে শক্তিশালী আধুনিক শস্ত্রে সজ্জিত সামারিক জেনারেলের থেকে নির্ভীক হতে পারেন।

জামাইকার মহান দার্শনিক 'মার্কস গর্মি' বলেছিলেন, 'People without knowledge of their past history, origin and culture are like a tree without root.' অর্থাৎ যে জাতি তার দেশের ইতিহাস, তার উৎপত্তি ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, সে জাতি শেকড়হীন বৃক্ষের মতো। আমরা ভারতবাসী সুদূর অতীত থেকে জ্ঞানগঙ্গার মহানদীতে বিচরণ করা জাতি। কিন্তু কয়েক দশক ধরে আমাদের ওপর হীনভাব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দয়ানন্দজী বলতেন--- অজ্ঞানী হওয়া অপরাধ নয়, অজ্ঞানী হয়ে থাকা অন্যায়। এজন্য আমাদের অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের আলোয় পৌছতে হবে।

স্বামী দয়ানন্দ বলতেন শিকড়ে ফেরার কথা, আর্যধর্মে ফেরার কথা। তিনিই বোধহয় প্রথম হিন্দুধর্ম থেকে ভয়ে বা প্রলোভনে ভিন্নধর্মে চলে যাওয়া, হিন্দু থেকে মুসলমান ও খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া মানুষকে শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মে ফেরানোর পথপ্রদর্শক। তাঁর মন্ত্রশিষ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের হাজারে হাজারে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সমগ্র মানবজাতিকে আর্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বানাবার কাজে দয়ানন্দজীর কথা সমস্ত দেশবাসীর স্মরণে রাখা উচিত। আজকের দিনে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লোভে সনাতন আর্যধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা করা হয়, ভোটের স্বার্থে হিন্দুধর্মকে জাতপাতে বিভাজিত করে গদি দখলের মাধ্যম করা হয়, তখন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর বাণী আরও বেশি করে স্মরণ করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হওয়াই আজ জাতির পরম কর্তব্য। □

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও বঙ্গীয় চিন্তন

কল্যাণ গৌতম

বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চাইতে তিনি ১২ বছরের বড়ো। ধর্মক্ষেত্রে এবং সমাজ সংস্কারে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) তখন সমগ্র ভারতবর্ষের সনাতনী হিন্দু সমাজের কাছে একটি জনপ্রিয় নাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম বিষয়ে অর্জন করেছিলেন দিব্যজ্ঞান। আর বেদভিত্তিক ধর্মীয় ভারতবর্ষের অবৈদিক আচরণ দূর করতে দয়ানন্দের বিখ্যাত স্লোগান ছিল, 'Back to the Vedas'। অর্থাৎ, ধর্মান্দোলনে তাঁর ভিত্তি ছিল বেদ।

স্বামী দয়ানন্দ বিশ্বাস করতেন বেদই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সকল সত্যের আধার। খ্রিস্টান ও ইসলামের বিপ্রতীপে একটি প্রবল প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদী সংস্থা হিসেবে উত্তর ভারতে সনাতনী হিন্দু ধর্মকে সরবে শক্তিশালী করে তোলবার জন্য তাঁর উদ্যোগে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেখানে একটি নীরব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি খ্রিস্টীয় পরত মাখা দিন (১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি) খ্রিস্ট মতকে অতিক্রম করে হিন্দুয়ানির পবিত্রতা লেপে তাকে বোল্ড আউট করে দিলেন, মহর্ষি দয়ানন্দ সেখানে শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে হিন্দু থেকে অহিন্দু হয়ে যাওয়া মানুষগুলিকে পুনরায় পরাবর্তন করে সনাতনী হিন্দু বানালেন। এই আন্দোলন যে ভারতীয় জাতিকে এক ধর্মে ও সমাজে গেঁথে দেওয়া তা আর আজ অস্পষ্ট নয়। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর এই প্রভাব হয়তো স্বামী বিবেকানন্দের উপরও বর্তেছিল। হিন্দুধর্মে পুনরায় ফিরে আসার ব্যাপারে স্বামীজীর মতামত হিসেবে নিবেদিতা তা উল্লেখ করেছেন নিজের গ্রন্থে।

কথামৃতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলছেন, 'দয়ানন্দ বাংলা ভাষাকে বলতো— গৌড়াণ্ড ভাষা'। গৌড় বঙ্গদেশের অন্যতম নাম। মহাভারতে গৌড় নামটি পাওয়া যায়, অবশ্য 'বঙ্গ নামটিও পাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে গৌড়পুর কথাটি আছে। হয়তো গুড়ের দেশ বলেই নামটি গৌড়। মধ্যযুগের বঙ্গভূমিতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য 'গৌড়ীয়' শব্দটি ব্যবহৃত হতো, জানিয়েছেন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (বাঙ্গালির সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪১-৪২)। বৈষ্ণব সমাজে 'গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ' কথাটি প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে নবদ্বীপ অথবা পশ্চিমবঙ্গের কোনো স্থান থেকে কেউ পুরীধামে উপস্থিত হলে, তিনি 'বাঙ্গালি' বলে নয়, 'গৌড়ীয়' বলে অভিহিত হতেন। এ বিষয়ে দয়ানন্দ সম্ভবত রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কারণ রামমোহন তাঁর রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যে সমগ্র বঙ্গভাষী বোঝাতে 'গৌড়জন' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এখন 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' দুটি নামেরই ইতিহাস আছে। সুনীতি কুমারের মতে 'গৌড়-বঙ্গ' এই যুগ্মনামের ব্যবহার দুই পুরাতন নামের স্মৃতি ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। দয়ানন্দের 'গৌড়' ভাবনাটি তাই বাঙ্গালির কাছে নতুন করে আলোচ্য হয়ে উঠেছে। যেমন গৌড়ীয় সংস্কৃতি, গৌড়ীয় নৃত্য, গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

রাজা রামমোহন রায়ের মতবাদের সঙ্গে দয়ানন্দের মতবাদের কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। দু'জনেই ছিলেন অপৌত্তলিক ও একেশ্বরবাদী। উভয়েই ছিলেন বর্ণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের মতো বিবিধ প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী। দু'জনকেই আমরা দেখি সমাজ সংস্কারের কাজে অংশগ্রহণ করতে। কালাপানি পার হওয়া বা সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল, তার বিরুদ্ধে দু'জনেই কথা বলেছেন। নিজের নিজের মতবাদ প্রচার করার জন্য দু'জনেই গ্রন্থ রচনা করেন। দয়ানন্দের জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম— 'সত্যার্থ প্রকাশ'। অপর বাঙ্গালি সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তবে দয়ানন্দ সরস্বতী যখন বঙ্গপ্রদেশে আসেন তখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। রাজা রামমোহন রায় তো দয়ানন্দের কিশোর বেলায় পরলোকগমন করেছিলেন। রামমোহন যেমন আপন মতবাদ কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, দয়ানন্দজী কিন্তু আপামর জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ আগ্রহে দয়ানন্দ সরস্বতী বঙ্গপ্রদেশে এসেছিলেন বৈদিক দর্শন প্রচারের জন্য। কেশবচন্দ্রের অনুরোধেই সংস্কৃত ও হিন্দিতে তিনি কলকাতার ভক্তমণ্ডলী ও শিক্ষিত সমাজের কাছে বেদব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৮৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি ভাগলপুর থেকে কলকাতায় এলেন। ১৮৭৩ সালের ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি কলকাতা, হুগলি ও বর্ধমানের নানান স্থানে অতিবাহিত করেন। তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বাগানে দেখেছিলেন। কথামৃতে পাওয়া যায়, 'দেখতে গিছলুম, তখন ওধারে একটা বাগান ছিল। . . .. খুব পণ্ডিত। . . . ইনি বুঝি হোম আর দেবতা মানতেন না, নিরাকারবাদী'। কলকাতায় আরও যে বিশিষ্টজনের সঙ্গে দয়ানন্দের সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন), ব্রাহ্মসমাজের নেতা ব্যারিস্টার

ফঃ ৪

চন্দ্রশেখর সেন (স্বামী দয়ানন্দ ছিলেন কাশীতে শাস্ত্র-বিচারের বিজেতা এবং এই বিচার সভায় শ্রীসেন উপস্থিত ছিলেন। ব্যারিস্টার সেন 'ভূপ্রদক্ষিণ' গ্রন্থের প্রণেতা), বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য শ্রী সত্যব্রত সামশ্রমী, শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ। রেভারেন্ড লালবিহারী দে-কে তিনি বৌদ্ধিক বিচারে পরাজিত করেন বলে জানা যায়।

কলকাতায় পৌঁছালে স্বামী দয়ানন্দজীকে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে আনা হলো। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হলো বরানগরের 'নৈনান বাগান বাড়ি'-তে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর নৈনান বাড়িতে থাকার সময় জনসমাগম ঘটতে দেখা যায়, দয়ানন্দজী বহু মানুষের ধর্মীয় প্রশ্নের জবাব দেন। ২২ ডিসেম্বর তাঁর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ত্রিদিব ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎলাভ হয়। ১৮৭৩ সালের ১ এপ্রিল তিনি বরানগর ত্যাগ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হুগলিতে আসেন এবং বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডলের বাগানবাড়িতে অবস্থান করেন। এখানে তিনি সংস্কৃতভাষায় বক্তৃতা দেন। বিশিষ্টজন এবং ভট্টপল্লীর পণ্ডিতেরা তাঁর বক্তব্যে মুগ্ধ হন। ৭-৮ এপ্রিল হুগলিতে পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্নের সঙ্গে মূর্তিপূজা বিষয়ে তাঁর শাস্ত্রবিচার চলে। এভাবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত হুগলি জেলার নানা স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেন। ১৩ এপ্রিল তিনি চলে যান বর্ধমানে এবং রাজা বনবিহারীর আমন্ত্রণে কাপুর রাজবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বর্ধমান রাজবাড়িতে অবস্থানকালে তাকে নানান ধর্মীয় উপদেশ দিতে দেখা যায়। অবশেষে ১৬ এপ্রিল তিনি বর্ধমান ত্যাগ করে ভাগলপুর যাত্রা করেন।

১৮৮৩ সালে যোধপুর রাজবাড়িতে অবস্থান করে তিনি স্বদেশি চেতনা জাগ্রত করছেন, সাত্ত্বিক জীবন অতিবাহিত করার উপদেশ দিচ্ছেন, সে সময় রাজপুত রাজার রক্ষিতা এক বাঈজির ষড়যন্ত্রে পাচক তাঁকে বিষ ও কাঁচের গুঁড়ো মেশানো দুধ পরিবেশন করে হত্যার চেষ্টা করে। রাজার শতচেষ্টাতেও তিনি আরোগ্য লাভ করেননি। ওই বছর ৩০ অক্টোবর আজমীঢ়ে তিনি সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর স্বামী দয়ানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কথামৃতে পাওয়া যায়, ১৮৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর সিঁথির এক ব্রাহ্মণ বেদান্তবাগীশের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংলাপ—

শ্রীরামকৃষ্ণ— কাশীতে অনেকদিন ছিলে, কী সব দেখলে, কিছু বলো। দয়ানন্দের কথা একটু বলো।

পণ্ডিত--- দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনি তো দেখেছিলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ— দেখতে গিছলুম, তখন ওধারে একটি বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সেদিন। তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্য ব্যস্ত হতে লাগলো। খুব পণ্ডিত। বাঙ্গলা ভাষাকে বলতো, গৌড়াণ্ড ভাষা। দেবতা মানতো— কেশব মানতো না! তা বলতো, ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না! নিরাকারবাদী। কাপ্তেন 'রাম রাম' কচ্ছিল, তা বললে, তার চেয়ে 'সন্দেশ সন্দেশ' বলো।

পণ্ডিত— কাশীতে দয়ানন্দের সঙ্গে পণ্ডিতদের খুব বিচার হলো। শেষে সকলে একদিকে, আর ও একদিকে। তারপর এমন করে তুললে যে পালাতে পাল্লে বাঁচে। সকলে একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে লাগলো— 'দয়ানন্দেন যদুক্তং তদ্ধেয়ম্'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৬৯ সালে কাশীর আনন্দবাগে বিচারে অবতীর্ণ হন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩)।

শুদ্ধি আন্দোলনের নবপর্যায়ে পথভ্রষ্ট হিন্দুদের স্বধর্মে ফেরার কী ব্যবস্থা আছে? থাকলে কী? কারা কারা এই চেষ্টায় সাহস জুগিয়েছেন? নিবেদিতা একবার এ ব্যাপারে স্বামীজীর মত জানতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছেন, 'অবশ্যই। তারা ফিরতে পারেন এবং তাদের গ্রহণ করাই উচিত'। বিপথগামী হিন্দু কারা সে বিষয়ে স্বামীজী বলেছেন, বিশাল সংখ্যক ভারতীয় যারা তরবারির আঘাতে ইসলামে বা খ্রিস্ট মতে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তারা বা তাদের উত্তর পুরুষেরা প্রত্যাবর্তন বা ঘর-ওয়াপসিতে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করার উপযুক্ত, যারা স্বেচ্ছায় নিজস্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে চান। যারা যুদ্ধের ফলে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়েছেন, অচেনা-অজানা বিধর্মী ব্যক্তি তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত হবে না, জানিয়েছিলেন স্বামীজী। আরও বলেছেন, প্রত্যাবর্তনকারীরা নিজেদের জাত ফিরে পাবেন আর নবাগতেরা নতুন জাত তৈরি করে নেবেন। নতুন করে তাদের হিন্দু নামকরণ করা হবে, জাত অনুযায়ী নামকরণের কথাই বলেছিলেন স্বামীজী। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিজেরাই বেছে নেবেন, কে শিবকে ইষ্ট দেবতা করবেন, কে কালীকে, অথবা কে গণপতি বাপ্পাকে।

অতএব মনে হয় কোথায় যেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। কী আয়োজন রেখেছে তাদের সম্মিলিত ভাবাদর্শের হিন্দুসমাজের বর্তমান পৌরোহিত্য, তা হয়তো সযত্নে লক্ষ্য করছেন ফেরায় প্রত্যাশী অহিন্দু মানুষ। হয়তো সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন তারা, আমন্ত্রণ আসুক। সেই লোকগীতির মতো, ভাই যেন বিবাহিত বোনকে বাপের বাড়ি নিয়ে যায়— 'কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া / আমার ভাই ধনরে কইয়ো, নাইওর নিতো বইলা / তোরা কে যাস, কে যাস?' যারা প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছেন এমন মানুষের জন্য এ দরজা খোলা রইবে না কেন? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত একাধিক বার বলেছেন, 'All people living in India are Hindu by identity। সমস্ত ভারতীয়ই হিন্দু। RSS regards 130 crore population of Indian as Hindu society'। যদি সদর্থক মানুষকে ফেরার দরজা খুলে দেওয়া যায়, তবেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর দ্বিশততম বর্ষে শ্রেষ্ঠ পুষ্পার্ঘ্য হবে।

তথ্যপঞ্জি:

(১) অতুলচন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, ১৯৯৩ জানুয়ারি পুনঃমুদ্রণ, মৌলিক লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩১৭ (২) নিতাই নাগ, ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজ সংস্কারে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, বিশ্ববাণী ২০২৩, ৮৫(৮): ৬১৬-৬১৭ (৩) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালির সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৩৬-৪২ (৪) শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, ঊনবিংশ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, thakurmaaswamiji.com (৫) মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, হিন্দু ভয়েস (Hindu Voice), সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৩। (৬) রামকৃষ্ণ কথামৃত ও মহর্ষি দয়ানন্দ রহস্য, back2thevedas.blogspot.com

ধর্মতলা রানি রাসমণি রোডে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কৃষক সমাবেশ

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে গত ১১ অক্টোবর কলকাতা ধর্মতলা রানি রাসমণি রোডে এক কৃষক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৬০০ কৃষক এবং জেলা কার্যকর্তারা সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ সভাপতি ভাইয়ারাম মৌর্য, পূর্ব ও উত্তরক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাস, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল, রাজ্য সহ সভাপতি আশিস সরকার, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনিমেশ পাহাড়ি, রাজ্য প্রচার প্রমুখ ড. কল্যাণ জানা, রাজ্য কোষাধ্যক্ষ পঙ্কজ বন্ধু, রাজ্য সদস্যা অলি ব্যানার্জি এবং ভারতীয় কিষাণ বার্তার সম্পাদক মিলন খামারিয়া।

কৃষক সমাবেশের দাবি ছিল, (১) ফসলের ন্যূনতম মূল্য (MSP)-এর পরিবর্তে লাভজনক মূল্য দিতে হবে। (২) প্রতিটি চাষযোগ্য জমিতে সেচের ববেস্থা করতে হবে। (৩) বিদ্যুতে ভরতুকি দিতে হবে। (৪) কৃষি যন্ত্রপাতি ও পণ্যের উপর থেকে জিএসটি তুলে দিতে হবে। (৫) প্রতিটি ব্লকে কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করতে হবে। এবং (৬) গোআধারিত কৃষি ফিরিয়ে আনতে হবে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মিলন খামারিয়া, শ্রীনিবাসজী, ভাইয়ারাম মৌর্য, অলি ব্যানার্জি, ড. কল্যাণ জানা, পঙ্কজ বন্ধু, অনিমেশ পাহাড়ি, কল্যাণ কুমার মণ্ডল, দীপঙ্কর নন্দী, সুজিত কাপাশি প্রমুখ। সমস্ত বক্তার বক্তব্যের মধ্যেই উঠে আসে, কৃষকদের ন্যায্য অধিকারের জন্য আরও সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং নিজেদের দাবি আদায় করে নিতে হবে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন আশিস সরকার এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায় ও প্রসেনজিৎ নাথ।

মালদা টাউন হলে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে সংস্কৃত সম্মেলন

গত ২ অক্টোবর সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে মালদা টাউন হলে পালিত হলো সংস্কৃত সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌরাঙ্গ ভার্মা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা হুসনা পারভীন এবং সংস্কৃতভারতীর পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। সম্মাননীয় অতিথিগণ প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভারম্ভ করেন। সরস্বতী বন্দনা করেন সানুবালা, নবনীতা ও ঈপ্সিতা। প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন মালদহ বিদ্যা ভারতীর সভাপতি বিজয় ঘোষ। সম্মাননীয় অতিথিগণ একে একে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের মাঝে মাঝে গীত পরিবেশন করেন সুমিত কর। নৃত্য পরিবেশন করেন কৌশিকী বিশ্বাস। সমবেত নৃত্য পরিবেশ করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। এছাড়াও গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন মালদহ হৃদ মাঝারের সংস্কৃতি শিল্পীরা। সমবেত গীতাপাঠ করেন গাজোল গীতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা। সংস্কৃত শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন গৌড়বঙ্গ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ধ্যেয়মন্ত্র পাঠ করে শিবাংশী পাণিগ্রাহী। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন মালদহ নগরের সংস্কৃতভারতীর কার্যকর্তারা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্কৃতভারতী মালদহ জেলা সংযোজিকা তাপসী মণ্ডল। শেষে শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন রাজদীপ সাহা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শৌর্য জাগরণ যাত্রা

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির উদ্বোধনের আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের উদ্যোগে দেশব্যাপী শৌর্য জাগরণ যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই যাত্রার মাধ্যমে দেশের যুব সমাজকে দেশের গৌরবময় ইতিহাস এবং পরাক্রমী মহাপুরুষদের বীরত্ব ও বলিদানের কথা তুলে ধরা হয়। রাজ্য প্রশাসনের দ্বারা উত্তরবঙ্গে এই যাত্রাকে বন্ধ করার অপচেষ্টা করা হলেও সংগঠনের বিধি প্রকোষ্ঠ আয়ামের কার্যকর্তারা তৎপরতার সঙ্গে হাই কোর্টে গিয়ে যাত্রার অনুমতি শেষ সময়ে আদায় করতে সক্ষম হয়। তার ফলে ২ অক্টোবর ভারত-ভুটান সীমান্ত জয়গাঁও থেকে রথযাত্রা শুরু হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সংগঠন মহামন্ত্রী বিনায়করাও দেশপাণ্ডে, প্রান্ত সহ সভাপতি শ্যামজী শর্মা এবং প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল। যাত্রাপথে রথ কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ৮ অক্টোবর শিলিগুড়ি পৌঁছায়। যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

শিলিগুড়িতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এয়ারভিউ মোড় থেকে শোভাযাত্রা করে রথকে হিন্দি হাই স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেবা প্রমুখ স্বপন মুখার্জি, লক্ষ্মণ বনসল এবং প্রান্ত বজরং সংযোজক প্রসেনজিৎ সরকার। অনুষ্ঠানে আদালতের নির্দেশ মতো পুলিশ প্রশাসন সমস্ত রকমের সহযোগিতা করে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বহরমপুরে গঙ্গা আরতি

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বহরমপুর নগর সমিতির উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারও মহালয়ার সন্ধ্যায় বহরমপুর খাগড়া গোপাল ঘাটে গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতার কলকাতা ক্ষেত্র প্রমুখ গৌতম সরকার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, তর্পণের দ্বারা শুধু পূর্বপুরুষ নয়, সমগ্র প্রাণী, কীটপতঙ্গ-সহ সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে তিল জল দ্বারা শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। এটাকেই হিন্দুত্ব হলা হয়। এই প্রসঙ্গে ইজরায়েলের শিশু, মহিলা-সহ সাধারণ নাগরিক যারা কট্টর ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী হামাসের বর্বরোচিত প্রাণ হারিয়েছে তাদেরও আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। মানুষের উপকারে কৃষিক্ষেত্র, জলবিদ্যুৎ, পরিবহণ, মৎস্যচাষ ইত্যাদিতে মা গঙ্গার অপার অবদানের কথা তুলে ধরা হয়। এই পবিত্র গঙ্গাকে পরিষ্কার রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানুষকেও সচেতন হবার আবেদন জানানো হয়। নগর সমিতির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি কৃষ্ণেন্দু সরকার, সম্পাদক সন্তোষ সূত্রধর, সৎসঙ্গ প্রমুখ বিবেকানন্দ মণ্ডল, দক্ষিণবঙ্গ সভানেত্রী সুনন্দা ঠাকুর-সহ বহু মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা সামাজিক সমরসতা প্রমুখ সন্তোষ রজক।

হাওড়া রাজাপুর-নিমতলায় আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ শিবির

আরোগ্য ভারতী হাওড়া গ্রামীণ জেলার উদ্যোগে রাজাপুর-নিমতলা রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে ২ অক্টোবর বিকেল পর্যন্ত এক আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সহ সংযোজক রাজেশ কর্মকার প্রদীপ প্রজ্বলন ও ধন্বন্তরীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে শিবিরের শুভারম্ভ করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সোমা খাঁড়া এবং ধন্বন্তরী স্তোত্র পাঠ করেন আরোগ্য ভারতীর বিভাগ সংযোজক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী।

জীবনশৈলী ও সংগঠন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজেশ কর্মকার, আরোগ্য ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ সভাপতি ড. অভিজিৎ ঘোষ, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। ভেষজ গাছগাছড়ার গুণাগুণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ মলয় সামন্ত। যোগ ও প্রাণায়াম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট যোগ বিশেষজ্ঞ অসিত প্রামাণিক। আকুপ্রেসার ও আকুপাংচার বিষয়ে হাত-কলমে শিক্ষা দেন সুমন সিনহা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশ্বরূপ খাঁড়া, সমীরণ প্রামাণিক, শুক্লা পাল, মহামায়া রায়। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন জেলা সহসভাপতি ভাস্কর কয়াল।

সমৃদ্ধির দেবী কোজাগরি লক্ষ্মী

প্রদীপ আচার্য্য

বিভিন্ন পুরাণে জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব লিখেছেন, ব্রহ্মা কর্তৃক জগৎ সৃষ্টির শুভলগ্নেই ভগবান বিষ্ণুর সম্মুখ অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম ও অধর্ম নামক দুটি গুণের। এই দুই গুণের দুই দেবতা সাত্ত্বিক ও তামসিক নামে পরিচিত। পাঁচ মহাশক্তির সম্মুখভাগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে পরমা সুন্দরী কমল বর্ণা, চতুর্ভুজা এক দেবীর। দৈববাণী অনুসারে ওই দেবীর সৃষ্টি হয়েছে দেবী রাধারানির পীঠ থেকে। দৈববাণী অনুসারে নাম রাখা হয়েছে লক্ষ্মী। একই সময়ে পরমাসুন্দরী গৌরবর্ণা, দ্বিভুজা এক দেবীর সৃষ্টি হয়েছে দেবী রাধারানীর পীঠ থেকে। দৈববাণী অনুসারে ওই দেবীর নাম রাখা হয়েছে অলক্ষ্মী। দৈববাণী অনুসারে ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মী দেবীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন আর অধর্ম নামক এক উপদেবতা অলক্ষ্মীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। পালন কর্তা ভগবান বিষ্ণুর কাছে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী দেবী জানতে চাইলেন ত্রিলোকে তাদের কী ভূমিকা থাকবে?

ভগবান বিষ্ণু বললেন— লক্ষ্মীদেবী মূলত বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী হয়ে সর্বদা বিরাজ করবেন আর অংশত তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, মর্ত্যে মর্ত্যলক্ষ্মী এবং প্রতি গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করবেন। যেখানে লক্ষ্মীদেবীর অনাদর হবে সেখানে তথা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই প্রধান তিন লোকে অলক্ষ্মীর আধিপত্য থাকবে। দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় মর্ত্যে কৃষি, বাণিজ্য, অর্থ, শান্তি ও সুখ বিরাজমান থাকবে। আর দেবীর অনাদর হলে অলক্ষ্মীর প্রাধান্য থাকবে। অলক্ষ্মী অধর্মের স্ত্রী হবার কারণে অধার্মিক লোকেরা অবৈধভাবে অতি অল্প সময়ে এবং সহজে বিপুল অর্থের মালিক হতে পারবে কিন্তু তাদের ওই অর্থ যে কোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। অলক্ষ্মী যেখানে বাস করে সেখানে অর্থ থাকলেও সুখ, শান্তি থাকে না। অধর্ম বাস করার ফলে অনৈতিক আচার ও আচরণের প্রতি গৃহের সদস্যরা আকৃষ্ট হয়ে দুঃখের সাগরে পতিত হয়। আর মা লক্ষ্মী বিরাজ করলে অর্থ, সম্মান এবং সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে। লক্ষ্মীদেবীর পূজার পুরোহিত মহিলারাই। তারা নিজেরাই শুদ্ধ বস্ত্রে এবং শুদ্ধ চিত্তে পরিবারের এবং জগতের মঙ্গল কামনায় জলপূর্ণ ঘটে আম্রপল্লব স্থাপন করে ফল, ফুল, দূর্বা, সিঁদুর দ্বারা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে দেবীর ব্রতকথা কীর্তন করে দেবীর পূজা সম্পন্ন করতে পারেন।

দেব সমাজ দেবীদের শ্রদ্ধার আসন দান করেছেন। তাই দেবী লক্ষ্মীকে যে কাজের ভার দিয়েছেন তাকে আধুনিক ভাষায় অর্থ, বাণিজ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। দেবী সরস্বতীকে দিয়েছেন শিক্ষা, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। দেবী গঙ্গাকে জল সম্পদের দায়িত্ব। দেবী দুর্গাকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব। এমনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেবীদের উপর অর্পণ করেছেন।

হিন্দু শব্দটি গুণবাচক। জাতিবাচক নয়। হিন্দু হচ্ছে একটি উন্নত সংস্কৃতির নাম। সুপ্রিম কোর্টও মুসলমানদের দ্বারা দায়ের

করা একটি মামলায় এই রায় দিয়েছেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থের জন্য মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে জগতে অশান্তির সৃষ্টি করেছে। দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা মানুষকে শুভবুদ্ধি দান করে পরিবারে, সমাজে এবং দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে।

জাগতিক জীবের দেহ ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ— এই পাঁচটি প্রাকৃতিক উপাদান এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিন প্রকার সত্তা দ্বারা গঠিত। অহংকারবশত মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে আসে। ভগবান বিষ্ণু মনুকে বলেছেন— হে মনু, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন প্রক্রিয়া সকল জীবের মধ্যেই বর্তমান থাকে। এই চার প্রকার জৈবিক ক্রিয়াদ্বারা বিচার করলে মানুষ এবং পশুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। শুধুমাত্র ধর্মই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করে রেখেছে। ধর্মের যে প্রধান নয়টি গুণ রয়েছে তা হলো— অহিংসা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, পরোপকারিতা, দান, দয়া, ক্ষমা, সমদর্শিতা প্রভৃতি। যে ঘরের মহিলারা দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করেন সে ঘরে ধর্ম বিরাজ করেন। ধর্ম বিরাজ করলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্মের মহৎ গুণগুলো পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়। আর যে ঘরের মহিলারা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন না, তাদের ঘরে অলক্ষ্মী এসে প্রবেশ করে। অলক্ষ্মী প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বামীর মধ্যেও অধর্ম এসে প্রবেশ করে। সেই পরিবার ভোগ ও বিলাসে লিপ্ত হয়ে গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়ে। মহিলারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় এবং পরপুরুষে আকৃষ্ট হয়ে পরিবারকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

সামান্য কলহও দেবী লক্ষ্মী সহ্য করতে পারেন না। সে কারণে মা লক্ষ্মীর পূজায় কাঁসর, বড়ো ঘণ্টা এবং ঢাক বাজানো নিষিদ্ধ। অজ্ঞানতার কারণে কয়েক বছর কোজাগরি লক্ষ্মীপূজার রাতে শব্দবাজি পোড়ানো হতো। এতে যেমন শব্দ দূষণ হতো তেমনি পরিবেশও দূষিত হতো। শব্দবাজি পোড়ানোর পরিমাণ কোর্টের নির্দেশে অনেকটাই কমে এসেছে। শব্দবাজি পোড়ানোর ঘটনা কমলেও বিভিন্ন প্রকারের আতসবাজি পোড়ানো হয়। এসব বাজিতেও গন্ধক থাকার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কাজেই কোনো প্রকার বাজি পোড়ানোই মা লক্ষ্মী সহ্য করতে পারেন না। লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায় আলোর ব্যবহার করা যায়। মোমবাতির আলোও পরিবেশ দূষিত করে। সেজন্য মুনি ঋষিগণ পূজায় ঘৃতের প্রদীপ জ্বালানোর কথা বলেছেন। ঘৃতের প্রদীপ জ্বালালে পরিবেশ শুদ্ধ হয়। এটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অভাবে সরিষা কিংবা অন্য তেল ব্যবহার করা যায়, তাতে পরিবেশ দূষিত হয় না। দেবর্ষি নারদের অনুরোধে দেবী লক্ষ্মী সত্যযুগে কৃপা করে মর্ত্যের অবন্তীনগরের দুর্দশাগ্রস্ত, রাজ্যহারা, বনবাসী রানিকে বৃদ্ধার ছদ্মবেশে দেখা দিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবারে ঘট স্থাপন করে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সাধ্যমতো ফুল ও ফলদ্বারা দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার কথা বলেছিলেন। সারা বছর এভাবে ব্রত করে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে রাত জেগে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করে ব্রত সমাপন করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

অবন্তী রাজ্যের যে বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে উল্লেখ রয়েছে তাতে বলা হয়েছে অবন্তী রাজের সময়ে দেবী লক্ষ্মী তার প্রাসাদে রাজলক্ষ্মীরূপে বিরাজমান ছিলেন। তার সাত পুত্র ছিল। রাজার মৃত্যুর পর তার সাত পুত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হলে পার্শ্ববর্তী রাজা রাজ্য দখল করে নেয় এবং সাত রাজকুমার আলাদা আলাদাভাবে সাধারণ প্রজার মতো জীবনযাপন করতে থাকে। রানি মনের দুঃখে বনে গমন করে বাস করতে থাকেন। ছদ্মবেশী মা লক্ষ্মীর পরামর্শে রানি রাজ্যে ফিরে এসে সাত পুত্রবধূকে লক্ষ্মীর ব্রত করার কথা বলেন। রানির কথামতো সাতপুত্রবধূ প্রতি বৃহস্পতিবারে এক একত্রিত হয়ে লক্ষ্মীর ঘট স্থাপন করে ব্রত পালন করতে থাকেন এবং আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে সারা রাত জেগে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন। তারপর মা লক্ষ্মীর কৃপায় সাত রাজকুমার সৈন্য সংগ্রহ করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং পৃথিবীতে দেবী লক্ষ্মীর মহাত্ম্য প্রচার করেন।

ভগবান আছে কী নেই, দেবী লক্ষ্মী আছেন কী নেই, এই নিয়ে তর্কবাগীশরা তর্ক করতে পারেন। পূজাপার্বণ এমনই এক বিষয় যার মাধ্যমে মনকে সংযত ও শুদ্ধ করা যায়। হিন্দুরা পরজন্ম বিশ্বাস করে বলে পাপ কাজ করতে ভয় পায়। যারা পরলোক মানে না, পরজন্ম মানে না তাদের পক্ষে সব ধরনের অনাচার সহজে করা সম্ভব। বারো মাসের তেরো পার্বণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে যে পবিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে তা থেকে যারা বেরিয়ে এসেছে তারা সাময়িক সুখ লাভ করলেও পরিণাম ভালো হয়নি। মাতৃশক্তি ভারতের তথা পৃথিবীর বড়ো শক্তি। পূজা পার্বণ মাতৃশক্তিকে ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত করে। দেবী মাতৃশক্তির প্রতীক। মায়ের কাছে প্রার্থনা তিনি জগতে সুখ ও সমৃদ্ধি দান করুন। □

বিস্মৃতির অতলে রাজা হরিপাল

মানস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাস থেকে অনেক হিন্দু রাজা এবং রাজবংশের কথা জানতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মধ্যযুগীয় ইতিহাসকে অনেক ঐতিহাসিক অবহেলায় পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা শশাঙ্কের কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে শুরু হয়েছিল এক মাৎস্যন্যায় (৬৫০-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতি থেকে বঙ্গদেশের শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করে এক স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বঙ্গদেশের পাল রাজবংশ।

বঙ্গের পাল বংশের সর্বপ্রথম রাজা ছিলেন (৭৫০-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) রাজা গোপালদেব পাল। গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দ) রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে পাল রাজাদের সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁদের রাজত্ব সীমা বর্ধিত হতে থাকে। সেই সময় পাল রাজারা ছোটো ছোটো অনেক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। ঠিক সেভাবেই বর্তমান হুগলি জেলায় তৎকালীন সময় (৮১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ) পাল বংশেরই এক সন্তান কুলপাল ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজা কুলপাল মহাবলবান ও দেশপাল নামেও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানী ছিল তৎকালীন শিমুলাই বা শিমুলগড়। বর্তমানে সেটা হুগলি জেলার হরিপাল। শিমুলাই বা শিমুলগড় কীভাবে হপিপাল হলো সে কথায় পরে আসছি।

এই রাজা কুলপালের দুই পুত্র সন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠ সন্তান হরিপাল এবং কনিষ্ঠ সন্তান অহিপাল। ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রাজা কুলপালের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বড়ো ছেলে হরিপালের রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি পিতার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেন। সেদিন থেকে তিনি হলেন রাজা হরিপাল। ছোটো ভাই অহিপাল ছিলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি। রাজা হরিপাল ছিলেন একজন সুশাসক, প্রজাপালক ও ধার্মিক চরিত্রের এক শক্তিশালী রাজা। তাঁর রাজধানীর নামও প্রথম দিকে ছিল শিমুলাই বা শিমুলগড়। পরবর্তীকালে এই শিমুলাই বা শিমুলগড় রাজা

হরিপালের নামানুসারে হরিপাল হয়ে যায়। অর্থাৎ বর্তমান হুগলি জেলার হরিপাল, মধ্যযুগে ছিল শিমুলাই বা শিমুলগড়। অতীতের এই শিমুলাই বা শিমুলগড়ের নামের পিছনে যুক্তি ছিল, এক সময় নাকি এই অঞ্চলে শিমুলগাছের আধিক্য ছিল এবং এই স্থান বস্ত্র শিল্পে বিখ্যাত ছিল। সে যাই হোক, রাজা হরিপালের রাজত্বের রাজধানী শহর যে হরিপাল ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজও যে কেউ হরিপাল বেড়াতে গেলে দেখতে পাবেন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন।

রাজধানী হরিপালকে কেন্দ্র করে তৎকালীন রাজার রাজত্ব এলাকার বহু স্থানের নাম আজও অক্ষত আছে। যেমন ভাণ্ডারহাটী ছিল রাজার ধনদৌলত ও খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার। বন্দিপুর ছিল রাজার জেলখানা বা কারাগার। হাতশেওলা ছিল রাজার হাতিশাল। নাইট ছিল নবহাট। চিত্রশাল ছিল রাজার ছবিঘর। ভগবতীপুর ছিল রাজার মা ভগবতী দেবীর ভবন। জামাইবাটী ছিল রাজার জামাতার বাড়ি। আম্রগাছিয়া ছিল রাজার আম্রকানন। জেজুর ছিল রাজার ভবন বা রাজবাড়ি। হরিপাল একসময় ষোলো ক্রোশ সাতাশ পাটিতে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে এক একটি পাটি এক একটি গ্রামে পরিণত হয়ে গেছে। সুদূর অতীতে বিমলা, ব্রাহ্মণী, কানা দামোদর ও কৌশিকী নদীর উচ্ছল জলধারা হরিপালের বুক চিরে প্রবাহিত হতো। এই সকল নদী বেষ্টিত এক সুন্দর ঐতিহাসিক রাজধানী শহর ছিল হরিপাল। এক সময় স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ছিল অতি মনোরম। জ্যোৎস্না মাখা রাতে এলাকাটি হয়ে উঠতো মায়াময় মনোমুগ্ধকর। ওই সকল নদী দিয়ে একসময় বিভিন্ন বাণিজ্য তরী ভেসে যেত দূরদূরান্তের দেশে। আজ সেই সকল নদী মজে গিয়ে সরু সরু খালের আকার ধারণ করেছে। কিছু নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে পুকুর তৈরি হয়ে গেছে। এমনকী মানুষের বসবাস স্থাপিত হয়ে গেছে। অতীতে রাজা হরিপাল তাঁর রাজত্ব এলাকার নিরাপত্তার কথা ভেবে, পাঁচদিকে পাঁচটি বড়ো গড় তৈরি করেছিলেন। সেই গড়গুলি ছিল : (১) বাহির গড়, (২) পাথর গড়, (৩) লোহার গড়, (৪) তামার গড়, এবং (৫) ভিতর গড়।

ওই সকল গড়গুলি বর্তমানে এক একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। অতীতে যেটা ছিল বাহির গড় বর্তমানে সেটা বাহির গড় নামে একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। যেটি বর্তমানে হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া গ্রামের পাশে অবস্থিত।

রাজা হরিপালের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। ছিল এক মাত্র কন্যা সন্তান। যাঁর নাম ছিল কানড়া। এই কানড়া ছিলেন রূপে গুণে এক অসামান্যা সুন্দরী। রাজা হরিপাল তাঁকে শিক্ষাদীক্ষা, যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্য পরিচালনা, ঘোড়ায় চড়া এমন বিভিন্ন দিক থেকে পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন। কথিত, তাঁর এই রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন গৌড় রাজ্যের বৃদ্ধ রাজা গৌড়েশ্বর রাজা হরিপালকে দূত দ্বারা তাঁর কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তখন রাজা হরিপাল গৌড়েশ্বরের রাজশক্তির কথা মাথায় রেখে কন্যাকে গৌড়েশ্বরকে বিবাহ করার কথা বলেন। তখন কন্যা কানড়া পিতাকে বলেন, গৌড়েশ্বর একজন বৃদ্ধ। তাই তাঁর পক্ষে তাঁকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। তখন রাজা হরিপাল বৃদ্ধরাজা গৌড়েশ্বরকে সে কথা জানালে, রাজা গৌড়েশ্বর রাজা হরিপালের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন কানড়াকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাজা হরিপাল তখন কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁর একমাত্র কন্যা বীরাঙ্গনা কানড়া পিতাকে বলেন, 'পিতা, আপনার কোনো চিন্তা নেই। আপনার কন্যা কানড়া জীবিত থাকতে তাকে কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।' এই বলে কানড়া হরিপালের বিখ্যাত মা চণ্ডালী মাতার পূজা করে (তিনি ছিলেন মা চণ্ডালীর পরম ভক্ত) গৌড়েশ্বর প্রেরিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে তিনি গৌড়েশ্বর রাজার সৈন্যদের পরাজিত করেন এবং সৈন্যরা হরিপাল ছেড়ে পলায়ন করে।

পরবর্তীকালে ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার বিবাহ হয়। ধর্মমঙ্গল পুস্তকেও কথা উল্লেখিত আছে। একটা সময় ছিল যখন রাজা হরিপাল তাঁর রাজত্ব এলাকার বহু স্থানে মঠ-মন্দির, ধর্মশালা, সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষ আজও কিছু কিছু স্থানে পরিলক্ষিত হয় হরিপাল বেড়াতে গেলে। সুদূর অতীতের রাজা কুলপাল প্রতিষ্ঠিত শিমুলাই বা শিমুলগড় যা আজকের হরিপাল, আর রাজা হরিপালের নামে প্রতিষ্ঠিত হরিপাল রাজত্ব এবং তার প্রকৃত ইতিহাস মানুষের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে তবু বলতে হয়, ইতিহাসের মৃত্যু নেই।

তথ্যসূত্র :

১. তোমার কথা— কবি রামমাধব মিত্র।

২. ধর্মমঙ্গল কাব্য।

৩.দিগ্বিজয়প্রকাশ সংস্কৃত গ্রন্থ।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ভারতের উত্থানের উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বকল্যাণ : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে মানবতার বিজয়কে চিহ্নিত করতে আমরা প্রতি বছর বিজয়াদশমী উদ্‌যাপন করি। এই বছর এই উৎসব গর্ব, আনন্দ এবং দেশবাসীর মনে উদ্দীপনা সঞ্চারকারী ঘটনাবলী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

গত এক বছর ধরে বড়ো বড়ো দেশের সংগঠন জি-২০'র সভাপতিত্বের ভূমিকায় ছিল আমাদের দেশ। সারা বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, প্রশাসক ও বিদ্বজ্জনদের উপস্থিতিতে বহু অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ভারতীয়দের উষ্ণ আথিতেয়তার অভিজ্ঞতা, ভারতের গৌরবময় অতীত এবং বর্তমানের উৎসাহপূর্ণ উত্থান অংশগ্রহণকারী অতিথিদের মুগ্ধ করেছে।

আফ্রিকান ইউনিয়নকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রথমদিনেই পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের প্রকৃত সদিচ্ছা ও কূটনৈতিক দক্ষতার অভিজ্ঞতা সকলেই অনুভব করেছেন। ভারতের অনন্য চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বসুধৈব কুটুম্বকমের দর্শন সমগ্র বিশ্ব এক নতুন দিশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। জি-২০'র অর্থনীতিকেন্দ্রিক ধারণা এখন মানবকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশের বর্তমান নেতৃত্ব বিশ্বমঞ্চে ভারতকে অন্যতম প্রধান ও শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

এবারে আমাদের দেশের ক্রীড়াবিদরা এশিয়ান গেমসে ২৮টি স্বর্ণ, ৩৮টি রৌপ্য ও ৪১টি ব্রোঞ্জ, মোট ১০৭টি পদক জয় করে আমাদের সকলের আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করেছেন। আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। চন্দ্রাভিযানের ক্ষেত্রে বিশ্বমানচিত্রে উদীয়মান ভারতের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তিগত কৌশল আজ স্বীকৃত। দেশের বর্তমান নেতৃত্বের আগ্রহ আমাদের বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এই প্রথম ভারতের বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের দক্ষিণমেরুতে অবতরণ করেছে। যে সমস্ত বিজ্ঞানী এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন, তাঁরা সমস্ত ভারতীয়কে গর্বিত করেছেন এবং দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছেন। তাঁদের সমগ্র

ফঃ ৫

দেশ সম্মান জানাচ্ছে।

সমগ্র জাতির প্রেরণার উৎস হলো জাতীয় আদর্শ এবং এই আদর্শ সেই জাতির বৈশ্বিক উদ্দেশ্য অর্জনে দিশা দেখায়। তাই আমাদের সংবিধানের মূল প্রতিকৃতির পৃষ্ঠায় যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চিত্র রয়েছে তাঁরই ভব্য মন্দির অযোধ্যায় নির্মাণ হচ্ছে। ঘোষণা করা হয়েছে, ২২ জানুয়ারি মন্দিরের গর্ভগৃহে শ্রীরামলালার শুভ অভিষেক সম্পন্ন হবে। ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে খুব সীমিত সংখ্যক মানুষ সেই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন। শ্রীরামচন্দ্র আমাদের দেশে মানবিক আচরণের প্রতীক, মর্যাদার প্রতীক, কর্তব্য পালনের প্রতীক, স্নেহ ও করুণার প্রতীক। শ্রীরামমন্দিরে রামলালার অভিষেক নিয়ে প্রতিটি স্থানেই এমন পরিবেশ তৈরি করা উচিত, যাতে সকলের হৃদয়ে শ্রীরাম জাগ্রত হন। আমাদের মননে যে অযোধ্যা বিরাজিত, সেখানে ভালোবাসা, প্রচেষ্টা ও শুভেচ্ছার ভাব জাগ্রত হোক। আয়োজন ছোটো হোক কিন্তু এই উদ্যোগ গ্রহণ করে অনুষ্ঠান হোক। বিগত কয়েক শতাব্দীর সংকটের ধারাবাহিকতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, সমস্ত সংকটকে পরাজিত করে ভারত এখন নিশ্চিতভাবেই ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। আমরা সকলেই এই ঘটনার সৌভাগ্যবান সাক্ষী।

সমগ্র বিশ্বকে যিনি অহিংসা, দয়া ও নৈতিকতার পথ দেখিয়েছিলেন সেই মহাবীর স্বামীর ২৫৫০তম নির্বাণবর্ষ। হিন্দু স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদেশিদের চাপিয়ে দেওয়া স্বৈরাচার থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শনকারী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের ৩৫০ বছর। ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা অর্জনের ৭৫ বর্ষপূর্তি এবং মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০তম জন্মবার্ষিকীও এবছর আমরা উদ্‌যাপন করেছি। আগামী বছরটি এমন দুই ব্যক্তিত্বের স্মরণের বছর, যাঁরা জাতীয় জীবনে চিরকালের অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছেন। আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার জন্য জীবন বলিদানকারী এবং উদ্যম, সাহস, ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পাশাপাশি প্রশাসনিক দক্ষতা এবং জনচেতনার জন্য মানুষের আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন রানি দুর্গাবতী। আগামী বছর তাঁর ৫০০তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ছিলেন ভারতীয় নারীশক্তির সামনে সর্বাত্মক প্রতিশ্রুতি, নেতৃত্বের ক্ষমতা, মূর্তিমান বিনয় এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ।

এই সঙ্গে আগামী বছর কোলাপুরের (মহারাষ্ট্র) শাসক ছত্রপতি শাহুজী মহারাজের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী। তিনি জনহিতৈষী ও প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে সামাজিক বৈষম্যকে নির্মূল করেছিলেন। এজন্য তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন।

এই রকমই তামিল সাধক শ্রীমদ্ রামলিঙ্গ ওয়াল্লালারের ২০০তম জন্মবার্ষিকী সম্পন্ন হয়েছে। তিনি যৌবনকাল থেকেই দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। গরিব মানুষদের জন্য তিনি যে অন্নদানের কর্মসূচি শুরু করেছিলেন তা এখনো তামিলনাড়ুতে চলছে। দেশের স্বাধীনতার পাশাপাশি তিনি সমাজে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং সামাজিক বৈষম্য নির্মূলের জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন।

এই সব প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্বের জীবনকে স্মরণ করে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসবের পূর্ণতার দিনে সামাজিক সাম্য, ঐক্য ও আত্মরক্ষার বার্তা পাই।

মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকে যে, সে যেন তার নিজের স্বকীয়তা ও পরিচয় রক্ষা করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে সকলে দ্রুত একে অপরের কাছাকাছি আসছে। সমস্ত জাতির মধ্যে এই বিষয়ে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বকে একই রঙে রাঙানো বা অভিন্নতা অর্জনের কোনো প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। ভারতের পরিচয় এবং হিন্দু সমাজের পরিচয় বজায় রাখার চিন্তা স্বাভাবিক। আজকের বিশ্বের সমসাময়িক চাহিদা মেটাতে নিজস্ব মূল্যবোধের ভিত্তিতে, সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করে ভারত অগ্রসরমান। আজকের বিশ্ব ভারতের কাছে এই-ই আশা করে। সমগ্র বিশ্ব আজ উপাসনাভিত্তিক সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত মতান্ধতা, ঔদ্ধত্য ও উন্মাদনার মুখোমুখি। স্বার্থের সংঘাত ও চরমপন্থার কারণে ইউক্রেন বা গাজা উপত্যকার যুদ্ধের কোনো সমাধান নেই। প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীবনযাপন, স্বার্থপরতা এবং লাগামছাড়া ভোগবাদ নিত্যনতুন মানসিক রোগের জন্ম দিচ্ছে।

মানসিক বিকার, বিশৃঙ্খলতা ও অপরাধপ্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। চরম স্বার্থপরতার কারণে পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে। প্রকৃতিকে সীমাহীন শোষণের কারণে দূষণ, উষ্ণতা বৃদ্ধি, ঋতুগত ভারসাম্যহীনতা এবং এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই বাড়ছে। সন্ত্রাস, শোষণ ও আগ্রাসন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বাকি বিশ্ব অসম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারবে না। তাই চিরন্তন মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ভারত নিজে উদাহরণ হয়ে বিশ্বকে প্রকৃত সুখ ও শান্তির পথ দেখাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই বিরূপ পরিস্থিতিগুলি ততটা ব্যাপক আকারে না হলেও আমাদের দেশেও প্রকট। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি আমরা হিমাচল প্রদেশে এবং উত্তরাখণ্ড থেকে সিকিম পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা প্রত্যক্ষ করছি। এসব ঘটনা ভবিষ্যতে আরও গুরুতর ও ব্যাপক সংকটের পূর্বাভাস দিচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা, জল সুরক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ভারতের উত্তর সীমান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেকোনো মূল্যে এটিকে রক্ষা করতে হবে। নিরাপত্তা, পরিবেশ, জনসংখ্যা ও উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমগ্র অঞ্চলকে একক হিমালয় অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর এই এলাকাটিতে ভূতাত্ত্বিকভাবে এখনো ভাঙা-গড়া চলছে এবং এ কারণে অস্থির। এই অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ, ভূতত্ত্ব, জীববৈচিত্র্য ও জল সম্পদের বৈশিষ্ট্য না জেনেই নির্বিচারে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

এই অবিমৃশ্যকারিতার ফলে এই অঞ্চল এবং সমগ্র দেশ সংকটের কিনারায় দাঁড়িয়ে। আমরা সকলেই জানি যে, এই অঞ্চলটি ভারত-সহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশে জল সরবরাহ করে। এই এলাকায় বহু বছর ধরে ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তাই এই এলাকার বিশেষ ভূতাত্ত্বিক, কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এই কথা মাথায় রেখে এই এলাকাটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে।

যদিও এই ঘটনাগুলি হিমালয় অঞ্চলে বেশি ঘটছে, তবু দেশের বাকি অংশের জন্য এগুলি সতর্কতার বার্তা। অপরিণামদর্শী, বস্তুবাদী ও চরম ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে উন্নয়নের পথে

এগোনোর ফলে মানবতা ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে এই উদ্বেগ বাড়ছে। এই সব ব্যর্থতার পথ পরিত্যাগ করে অথবা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ভারতীয় মূল্যবোধ এবং ভারতের সামগ্রিক একাত্মতার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, কালানুগ ও আধুনিক প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত নিজস্ব স্ব-তন্ত্র উন্নয়নের পথ এই দেশকেই তৈরি করতে হবে। এটি ভারতের জন্য উপযুক্ত হবে এবং বিশ্বের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল হতে পারে। অন্ধানুকরণ, জড়তা, গোঁড়ামি এবং ভুল পথে চলার প্রবণতা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। আমাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং আমাদের দেশের জন্য যা উপযোগী তা সময়োপযোগী করে আমরা আমাদের স্ব-আধারিত উন্নয়নের স্বদেশি বিকাশের পথ গ্রহণ করতে পারি, এটাই সময়ের আবশ্যকতা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিক কিছু নীতির পরিবর্তন হয়েছে এমনটা দৃষ্টিগোচর হয়। সমাজেও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিষেবা, সমবায় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন সফল পরীক্ষার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু প্রশাসনের ক্ষেত্রে এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা এইসব ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করেন এবং দিকনির্দেশনা দেন,তাঁদের মধ্যে এই ধরনের সচেতনতা বেশি প্রয়োজন। সরকারের 'স্ব'-নির্ভর সুযোগসুবিধা, প্রশাসনের তৎপরতা, ধারাবাহিক ও জনমুখি কাজ এবং উন্নয়নমূলক কাজে সমাজের সহযোগিতা ও সমর্থনই দেশকে পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাবে।

কিন্তু এটা যাতে সম্ভব না হয়, সমাজের ঐক্য যাতে বিঘ্নিত হয় এবং দেশে বিচ্ছিন্নতা ও সংঘাত বৃদ্ধি পায়, সেই অপচেষ্টাও বাড়ছে। আমাদের অজ্ঞতা, অবিবেচনা, পারস্পরিক অবিশ্বাস বা অসতর্কতার কারণে সমাজের কোথাও কোথাও এ ধরনের অপ্রত্যাশিত অশান্তি ও বিভেদ বাড়তে দেখা যায়। ভারতের উত্থানের উদ্দেশ্যই হলো বিশ্ব কল্যাণ। কিন্তু এই উত্থানের স্বাভাবিক ফল হিসেবে স্বার্থপর, বিভেদকামী ও প্রতারক শক্তিগুলি চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। তাই তাদের পক্ষ থেকে এই উত্থানের নিরন্তর বিরোধিতাও চলছে। এই দেশবিরোধী শক্তিগুলি কোনো না কোনো মতাদর্শের ছদ্মবেশে এবং কিছু মনোমোহিনী ঘোষণা বা লক্ষ্যের জন্য কাজ করার ভান করে। কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্য কিছু। মতাদর্শ নির্বিশেষে যাঁরা সত্য ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে কাজ করেন, সে যেকোনো ধরনের কাজই করুক না কেন, তাঁদের জন্য এইসব অপশক্তি সদাসর্বদা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আজকাল এই সর্বগ্রাসী শক্তির লোকেরা নিজেদের সাংস্কৃতিক মার্কসবাদী, (Woke) অর্থাৎ 'জাগ্রত জনতা' হিসেবে নিজের তুলে ধরে। ১৯২০ সালের পর তারা কিন্তু মার্কসকেও ভুলে গেছে। তারা সারা বিশ্বের সমস্ত শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান ও সংযমের বিরোধী। মুষ্টিমেয় লোক যাতে সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই উদ্দেশে তারা নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারের পক্ষে ওকালতি করে, প্রচার করে এবং ছড়িয়ে দেয়। মিডিয়া ও বিভিন্ন শিক্ষাসংস্থান কুক্ষিগত করে দেশের শিক্ষা, মূল্যবোধ, রাজনীতি ও সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত ও দুর্নীতির আখড়া করে তোলাই তাদের কাজের ধরন।

এই পরিস্থিতিতে মিথ্যা, বিকৃত ও অতিরঞ্জিত তথ্যের মাধ্যমে ভয়, বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত, বিভ্রান্ত, দুর্বল ও ভঙ্গুর সমাজ অজান্তেই এই ধ্বংসাত্মক আধিপত্যবাদী শক্তির শিকারে পরিণত হয়। এই ধরনের কাজ যা দেশের একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস, বিভ্রান্তি এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে । আমাদের ইতিহাসে একে 'মন্ত্রবিপ্লব' বলা হয়।

দেশে রাজনৈতিক স্বার্থপরতার কারণে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত শক্তির সঙ্গে জোট গঠন করা অবিবেচক কাজ। যেখানে আগে থেকেই সমাজ আত্মবিস্মৃত হয়ে, নানা ধরনের বিভাজনে জর্জরিত এবং স্বার্থপরতা, হিংসা ও বিদ্বেষের মারাত্মক প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েছে। সেজন্য এইসব আসুরিক শক্তিগুলিও সমাজ বা রাষ্ট্রের বিভাজনকারী অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক শক্তির সমর্থন পায়।

মণিপুরের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে এই বিষয়টি মাথায় আসে। প্রায় এক দশক ধরে শান্তিপূর্ণ থাকা মণিপুর হঠাৎ করে পারস্পরিক সংঘর্ষে কেন লিপ্ত হলো? যারা হিংসায় ইন্ধন জোগাচ্ছে তাদের মধ্যে কি সীমান্তের ওপারের চরমপন্থীরাও ছিল? কেন এবং কাদের দ্বারা নিজেদের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত মণিপুরী মৈতেই সম্প্রদায় ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে একটি সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল? বছরের পর বছর ধরে সমান দৃষ্টি দিয়ে সকলের সেবায় নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো একটি সংগঠনকে বিনা কারণেই এর মধ্যে টেনে আনায় কাদের গোপন স্বার্থ নিহিত? এই সীমান্ত এলাকায় নাগাভূমি ও মিজোরামের মধ্যে অবস্থিত মণিপুরে এমন অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিতে কোন বিদেশি শক্তি আগ্রহী হতে পারে? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-রাজনীতিরও কি এই ঘটনার কারণগত ঐতিহ্যের কোনো ভূমিকা আছে? দেশে শক্তিশালী সরকার থাকা সত্ত্বেও কার জোরে এতদিন ধরে এই হিংসাত্মক ঘটনা অর্বাধে চলতে থাকে? গত ন'বছর ধরে চলমান শান্তি বজায় রাখায় অঙ্গীকারবদ্ধ একটি রাজ্য সরকার থাকা সত্ত্বেও কেন এই হিংসা ছড়িয়ে পড়ে এবং চলতে থাকে? বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন সংঘাতে জড়িয়ে পড়া উভয় পক্ষের মানুষ শান্তি কামনা করছে, তখন সেদিকে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ঘৃণা ও সহিংসতাকে উসকে দেওয়া শক্তি কারা? এই সমস্যা সমাধানে বহুমাত্রিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

এজন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সমন্বিত সক্রিয়তা ও কর্মদক্ষতা যেমন প্রয়োজন, তেমনই পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ দূর করতে সমাজের আলোকিত নেতৃত্বকেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগের। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সামাজিক স্তরে সকলের সেবা ও ত্রাণকার্যে নিরত থেকে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শক্তির কাছে শান্তির জন্য আবেদন করছে।

সবাইকেই আপনজন মনে করে নিরাপদ, সংগঠিত, সম্প্রীতিপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সব ধরনের মূল্য দিতে প্রস্তুত থেকে কার্যরত থাকাই হলো সঙ্ঘের প্রয়াস। যেভাবে এই ভয়ানক ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ঠাণ্ডা মাথায় তারা সবাইকে সামলানোর চেষ্টা করেছে, সেজন্য আমরা আমাদের স্বয়ংসেবকদের জন্য গর্বিত।

এই 'মন্ত্রবিপ্লব'-এর সঠিক উত্তর সমাজের ঐক্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে এই ঐক্যবোধই সমাজের বিবেক জাগ্রত

রাখে। এই মানসিক ঐক্য অর্জনের বিষয়টিও সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি দেশে এই ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টিকারী ভিত্তিটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোথাও সেই দেশের ভাষা, কোথাও বাসিন্দাদের সাধারণ উপাসনা বা বিশ্বাস, কোথাও অভিন্ন ব্যবসায়িক স্বার্থ, কোথাও কোথাও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দৃঢ় বন্ধন দেশের মানুষকে একত্রিত করে। কিন্তু মানবসৃষ্ট কৃত্রিম ভিত্তি বা স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ঐক্যের সূত্র টেকসই নয়। আমাদের দেশে এত বৈচিত্র্য যে এক দেশ হিসেবে এই দেশের অস্তিত্ব বুঝতে মানুষের সময় লাগে। কিন্তু আমাদের এই দেশ জাতি হিসেবে, সমাজ হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসের সব চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অতীতের সূত্রে অটুট সংযোগ বজায় রেখে আজও বেঁচে আছে। 'য়ুনান মিস্র রোমা সব মিট গয়ে জঁহা সে, অব তক মগর হ্যায় বাকি নামো নিশাঁ হমারা। কুছ বাত হ্যায় কি হস্তি মিটতী নহীঁ হমারী, সদিয়োঁ রহা হ্যায় দুশমন দৌরে জহাঁ হমারা।' অর্থাৎ গ্রিস, মিশর, রোম সব যাদের দ্বারা বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের নাম ও পতাকা আজও অম্লান। কিছু কথা আছে যে আমাদের মহানতা হারায় না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শত্রুতার মুখোমুখি আমরা।

এই জাতীয় ঐক্যের ঐতিহ্য ভারতের বাইরের মানুষের মনকে বিস্মিত করে রাখে, সকলের মন আকর্ষিত হবে এরকম ঐক্য আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। এই ঐক্যের পেছনে রহস্য কী? নিঃসন্দেহে এটা আমাদের সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতিই। উপাসনা পদ্ধতি, ভাষা, জাতপাত ইত্যাদি ভেদের ঊর্ধ্বে উঠে, আমাদের নিজ পরিবার থেকে সমগ্র বিশ্বকে এক পরিবারে প্রসারিত করতে শেখায় আমাদের আচরণ ও জীবনশৈলী। আমাদের পূর্বপুরুষরা অস্তিত্বের এই মূলভূত ঐক্যের সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলস্বরূপ, শরীর, মন ও বুদ্ধির একসঙ্গে উন্নতি করে থেকে তিনটিরই সুখ প্রদানকারী অর্থ ও কামনার সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের মোক্ষের দিকে চালনাকারী ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁরা অবগত হয়েছেন। সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁরা একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন যা ধর্মতত্ত্বের চারটি শাশ্বত মূল্য— সত্য, করুণা, পবিত্রতা ও তপস্যার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছে সব দিক থেকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ আমাদের মাতৃভূমির খাদ্যাভ্যাস, জল ও আবহাওয়ার কারণে।

তাই আমাদের ভারতভূমিকে আমরা মূল্যবোধের অধিষ্ঠাত্রী মা মনে করে তাকে ভক্তি ও পূজা করি। সম্প্রতি আমাদের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করেছি। যে মহাপুরুষরা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজ ও দেশকে রক্ষা করেছেন, সময়ে সময়ে তার প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন এবং তার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা হলেন আমাদের কঠোর পরিশ্রমী পূর্বপুরুষ, যাঁরা আমাদের সকলের গর্বের উৎস ও অনুকরণীয়। তিনটি উপাদান— মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি, পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ববোধ এবং সকলের জন্য অভিন্ন সংস্কৃতি— আমাদের দেশে বিদ্যমান ভাষা, অঞ্চল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বর্ণ, উপজাতি ইত্যাদি সমস্ত বৈচিত্র্যকে একত্রিত করে এবং এ আমাদের একতার অভিন্ন অক্ষুণ্ণ সূত্র।

সমাজের স্থায়ী ঐক্য উৎপন্ন হয় আত্মীয়তা থেকে, স্বার্থপর চুক্তি থেকে নয়। আমাদের সমাজ অনেক বড়ো ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ থেকেও কিছু মত-পথ আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে, তবু আমাদের সমাজ এই তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি অনন্য সমাজ হিসেবে থেকে গিয়েছে। তাই ঐক্যের কথা বলার সময়ে মনে রাখতে হবে, কোনো লেন-দেনের মাধ্যমে এই ঐক্য অর্জিত হবে না। জোর করে তৈরি করলে বারবার নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান পরিবেশে সমাজে অনৈক্য ছড়ানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা দেখে স্বভাবতই অনেকে চিন্তিত। নিজেদের হিন্দু বলেন এমন বহু ভদ্রলোক খুঁজে পাওয়া যায়, উপাসনা পদ্ধতি অনুযায়ী মুসলমান ও খ্রিস্টানও পাওয়া যায়, যাঁরা বিশ্বাস করেন অবরোধ, বিবাদ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে মিলন, নিরাপত্তা ও শান্তির পথে চলাই সর্বোত্তম। এই আলোচনাই প্রথমেই যে কথাটি মনে রাখতে হবে তা হলো ঘটনাক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায় এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার বিষয় এটি নয়। আমরা অভিন্ন পূর্বপুরুষের বংশধর, এক মাতৃভূমির সন্তান, এক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পারস্পারিক ঐক্য ভুলে গেছি। আমাদের মূলভূত ঐক্য বুঝতে হবে এবং সেই ভিত্তিতে আবার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আমাদের মধ্যে কি কোনো সমস্যা নেই? নিজেদের উন্নয়নের জন্য আমাদের কি কোনো চাহিদা ও প্রত্যাশা নেই? আমরা কি নিজেদের বিকাশ লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করি না? আমরা কি সবাই কায়মনোবাক্যে আমাদের ঐক্যের নীতি অনুসারে আচরণ করি? সবাই জানে যে এটা সবার ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু এটা ঘটুক বলে যারা চায় তারা এই বলে সন্তুষ্ট হবেন না যে, আগে আমাদের সমস্যার সমাধান হোক, আগে সব প্রশ্নের মীমাংসা হোক, তারপর ঐক্যের বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে। আমাদের সকলকে বুঝতে হবে যে, আমরা যদি আত্মীয়তার দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে আমাদের আচরণ শুরু করি, তাহলে সমস্যার সমাধানও তা থেকে বেরিয়ে আসবে। ইতস্তত ঘটতে থাকা ঘটনায় বিভ্রান্ত না হয়ে আমাদের শান্তি ও সংযমের সঙ্গে কাজ করতে হবে। সমস্যাগুলো বাস্তব, কিন্তু সেগুলো শুধুমাত্র একটি জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্যের মানসিকতাও তৈরি করতে হবে। 'আমি পরিস্থিতির শিকার'– এই মানসিকতা, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকানো অথবা রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কৌশল থেকে সরে আসতে হবে। এধরনের কাজে রাজনীতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটি আত্মসমর্পণ বা বশ্যতার কোনো লক্ষণ নয়। দুই যুদ্ধরত পক্ষের মধ্যে কোনো যুদ্ধবিরতি মাত্রও নয়। এটি ভারতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক ঐক্যসূত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান। আমাদের স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ৭৫তম বছরও চলছে। সেই সংবিধান আমাদের এই দিক নির্দেশ করে। সংবিধান প্রণয়নের সময় গণপরিষদে শ্রদ্ধেয় ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের দেওয়া দুটি বক্তৃতার দিকে যদি আমরা মনোযোগ দিই তাহলে একই সারমর্ম বোঝা যাবে।

এটা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। পুরানো দ্বন্দ্বের তিক্ত স্মৃতি এখনো আমাদের সকলের মনে গেঁথে আছে। দেশবিভাগের ভয়াবহতার ক্ষত অনেক গভীর। তার কর্ম ও প্রতিক্রিয়ার কারণে মনের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়, তা তার কথাবার্তা ও আচরণে প্রকাশ পায়। একে অপরের এলাকায় ঘর না পাওয়া থেকে শুরু করে একে অপরের প্রতি

অবজ্ঞা ও অবহেলার মতো আচরণ করা ইত্যাদি তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। হিংসা, দাঙ্গা, নির্যাতন ইত্যাদি ঘটনার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করার ঘটনাও ঘটে। কিছু লোকের অপকর্মকে সমগ্র সমাজের কার্যকলাপ ধরে নিয়ে উত্তেজক বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনা শোনা যায়। চ্যালেঞ্জ ও পালটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়, যা উসকানি হিসেবে কাজ করে।

আমাদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে যে শক্তিগুলো দেশ ভাঙতে চায়, তারাও এর সুযোগ নেয়। দেখতে একটি ছোটো ঘটনাকে বড়ো করে দেখিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। দেশ ও বিদেশ থেকে উদ্বেগ প্রকাশকারী বিবৃতি ও সাবধানবাণী দেওয়া হয়। সহিংসতাকে উসকে দেওয়া 'টুল কিটস' সক্রিয় হয়ে যায় এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঘৃণা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

যারা সমাজে সম্প্রীতি চায় তাদের সবাইকে এই মারণ খেলার ছলনা থেকে দূরে থাকতে হবে। এই সব সমস্যার সমাধানসূত্র ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। সেজন্য দেশে আস্থা ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি পূর্বশর্ত। নিজের মনকে স্থির রেখে আত্মবিশ্বাসী হয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে, পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে হবে, পারস্পরিক বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হতে হবে এবং সবার মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেতে হবে। এভাবেই কায়মনোবাক্যে চলতে হবে। প্রচার বা অনুমান নিয়ে নয়, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। ধৈর্য, সংযম ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে, নিজের কথা ও কাজে উগ্রতা, ক্রোধ ও ভয় পবিহার করে, দৃঢ়তার সঙ্গে, সংকল্পবদ্ধ হয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অপরিহার্য। বিশুদ্ধ চিত্তে কাজ করার সৎসংকল্প তখনই পূর্ণ হবে।

প্রতিটি পরিস্থিতিতে যতই উসকানি থাকুক না কেন আইনশৃঙ্খলা, নাগরিক শৃঙ্খলা ও সংবিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক। একটি স্বাধীন দেশে এই আচরণকে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ রূপে বিবেচনা করা হয়। মিডিয়াকে ব্যবহার করে উসকানিমূলক অপপ্রচার এবং এর ফলে যে অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের প্রতিযোগিতা হয় তাতে ফেঁসে গেলে চলবে না। সমাজে সত্য ও অন্তরঙ্গতা ছড়িয়ে দিতে মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে। হিংসা ও গুন্ডামির সমাধান হলো সংগঠিত শক্তিসম্পন্ন সমাজের আইন শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও প্রশাসনকে যথাযথ সহায়তা দেওয়া।

আগামী ২০২৪ সালের প্রথমদিকে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনী খেলার আবেগ উসকে দিয়ে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তা ঘটবেই। আসুন, সমাজকে বিভক্ত করে এমন বিষয়গুলো পরিহার করি। ভোট দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। তা পালন করতে হবে। দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা, স্বাভিমান ও উন্নয়নের বিষয়গুলি বিবেচনা করে ভোট দিতে হবে।

২০২৫ থেকে ২০২৬ সাল হলো সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তির বছর। পূর্বোক্ত সমস্ত বিষয়ে এবং দেশের প্রয়োজনে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এগিয়ে যাবে, সেবিষয়ে তারা প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে। সামাজিক আচারআচরণ ও কথাবার্তায় দেশের প্রতি সমগ্র সমাজের আনুগতের প্রকাশ পাক। মন্দির, জলাশয়, শ্মশানে প্রবেশে কোনো বৈষম্য থাকলে তার অবসান ঘটাতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে প্রতিদিন আলাপ-আলোচনা, সংস্কারিত আচরণ ও সংবেদনশীলতা অব্যাহত রাখা এবং সেসব গুণের বিকাশ অব্যাহত রাখা উচিত। এরকম আদর্শ পরিবারের দ্বারা সমাজের সেবা অব্যাহত রাখতে হবে। নিজের বাড়ির জল সংরক্ষণ করে, প্লাস্টিক বর্জন করে এবং আপনার আঙ্গিনার চারপাশে সবুজায়ন বৃদ্ধি করে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন। স্বদেশি আচারের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বন বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে।

অনর্থক ব্যয় বন্ধ করতে হবে। দেশে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে এবং দেশের অর্থ দেশের মধ্যেই ব্যবহার করতে হবে। তাই স্বদেশির আচরণও পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিকত্বের নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং সমাজের সর্বত্র পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার পরিবেশ বিরাজ করতে হবে। এই পাঁচটি আচরণগত বিষয় বিকশিত হোক, তা সবাই চায়। কিন্তু ছোটোখাটো বিষয় থেকে শুরু করে সেগুলোর চর্চা করে, আমাদের স্বভাবে এই আচরণ গ্রহণ করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আগামীদিনে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের অভাবী বন্ধুদের সেবা করার পাশাপাশি, এই পাঁচ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ চালিয়ে সমাজকে এতে সহভাগী ও সহযোগী করার চেষ্টা করবে। সরকার, প্রশাসন এবং সমাজের সজ্জনশক্তি সমাজের স্বার্থে যা কিছু করছেন বা করতে চাইছেন, সেই কাজে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সহযোগিতা প্রতিনিয়ত আগের মতোই চলতে থাকবে।

সমাজের ঐক্য, সতর্কতা এবং সর্বক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ প্রয়াস যখন জনকল্যাণকামী সরকার ও জনমুখী প্রশাসন 'স্ব'-এর ভিত্তির ওপর অধিষ্ঠিত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা সঙ্গে প্রচেষ্টা চালায়, তখনই রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হয়। শক্তি ও গৌরবে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের কাছে যখন আমাদের সনাতন সংস্কৃতি সবাইকে তার একই পরিবারভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করার মতো একটি সংস্কৃতি থাকে, যা অন্ধকার থেকে আলোতে, অসত্য থেকে সত্যের দিকে নিয়ে যায় এবং যা আমাদের নশ্বর জীবন থেকে সার্থকতার অমৃতময় জীবনের দিকে নিয়ে যায়, তখন সেই রাষ্ট্র পৃথিবীর হারানো ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে এবং বিশ্বকে একটি সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনের আশীর্বাদ প্রদান করে। বর্তমান সময়ে আমাদের সনাতন জাতির পুনরুত্থানের উদ্দেশ্য এটাই।

রাজচক্রবর্তীর সন্তান,
সঙ্গে নিয়ে জগদ্‌গুরুর জ্ঞান
এগিয়ে চললে আসবে স্বর্ণিম প্রভাত
করতে অভিষেক।
প্রশ্ন অনেক কিন্তু উত্তর এক।

।। ভারতমাতা কী জয়।।

(নাগপুরে বিজয়াদশমী উৎসব উপলক্ষ্যে সরসঙ্ঘচালকজীর ভাষণ)

নবাঙ্কুর

দেবী কৌশিকী

দুই দুর্ধর্ষ দানব শুম্ভ ও নিশুম্ভ। এরা সহোদর ভাই। ইন্দ্রের বিমাতা দনু এদের মা। ইন্দ্রের পিতা মহর্ষি কশ্যপ এদেরও পিতা। এরা দুই ভাই পাতাল রাজ্যে বাস করত। একাসনে দশ হাজার বছর তপস্যা করলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা এদের দর্শন দিয়ে বর চাইতে বললেন। তারা ব্রহ্মার কাছে অমরত্বের বর চায়। কিন্তু ব্রহ্মা সে বর দিতে অস্বীকার করলেন। এরা তখন বর চাইল— দেবতা, অসুর, পশুপাখি প্রভৃতি কোনো পুরুষ প্রাণীর হাতে যেন তাদের মৃত্যু না ঘটে। ব্রহ্মা তাদের সেই বরই দিলেন।

এই বর লাভের পর ভৃগুমুনি এদের পুরোহিত হয়ে শুম্ভকে সিংহাসনে অভিষেক করেন। এরপরেই দানবরা দুর্বার হয়ে ওঠে। তাদের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

শুম্ভ-নিশুম্ভের আরও একটি ছোটো ভাই ছিল, তার নাম নমুচি। সে স্পর্ধাভরে স্বর্গ জয় করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাতে নিহত হলো। ফলে শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে দানবদের একত্রিত করে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। দানবদের সেই প্রচণ্ড আক্রমণে দেবতারা পরাজিত হলে শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে।

এদিকে একদিন শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে সংবাদ আসে যে বিন্ধ্যপর্বতে দেবী কৌশিকী মহিষাসুরকে বধ করেছেন। সেই ভয়ে মহিষাসুরের প্রধান অনুচর তথা সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড জলের নীচে আত্মগোপন করে আছে। এই সংবাদে শুম্ভ মহা খাপ্পা হয়ে তার অনুচরদের নিয়ে এসে চণ্ড-মুণ্ডের সঙ্গে মিলিত হলো। তারপর বিন্ধ্যপর্বতে কৌশিকীদেবীর কাছে দূত মারফত সংবাদ পাঠায় যে দেবী কৌশিকী যেমন ত্রিলোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, তেমনই শুম্ভ-নিশুম্ভও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। সুতরাং তিনি যেন তাদের দুজনের মধ্যে যে কোনো একজনকে পতিত্বে বরণ করেন।

দেবী কৌশিকী দানবদের স্পর্ধিত উক্তি শুনে বলে পাঠালেন, ক্ষমতা যার আছে সে যেন তাকে জয় করে নিয়ে যায়।

দেবীর এই উত্তর স্বভাবতই শুম্ভ-নিশুম্ভের মনঃপুত হলো না। তারা সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দেবীকে ধরে আনতে ধূম্রলোচন নামে এক দানবকে পাঠাল।

যুদ্ধে দেবীর হাতে মৃত্যু হলো ধূম্রলোচনের। তখন চণ্ড-মুণ্ড দুই ভাইকে পাঠানো হলো। দেবীর হাতে তাদেরও মৃত্যু হলো।

তখন শুম্ভ-নিশুম্ভ দানবকুলের সঙ্গে রক্তবীজ দানবকে সঙ্গে নিয়ে দেবী কৌশিকীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল। এই রক্তবীজ দানবের এমনই মহিমা ছিল যে তার এক ফোঁটা রক্ত থেকে এক-একটি দানব সৃষ্টি হয়। দেবী কৌশিকী কালীরূপ ধারণ করে রক্তবীজ সমেত সমস্ত দানবকে নিধন করলেন। তারপর নিশুম্ভ ও শুম্ভও দেবীর হাতে নিহত হলো। তখন ইন্দ্র আবার তাঁর স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন।

শ্যামাপদ সরকার

বীর বনবাসী

রানি রোপুইলিয়ানি

জন্ম ১৮২৮ সালে মিজোরামে। মিজো সমাজের মানুষ ছিলেন তিনি। মিজোরামের মহান রাজা লালসাবুঙ্গার নাতনি ছিলেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর রালাবাবং থেকে নিজের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। মিজো জনজাতিদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনী বেশ কয়েকবার তাঁকে ধরবার চেষ্টা করে নিষ্ফল হয়। তাঁর সঙ্গে এক যুদ্ধে ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট স্টুয়ার্ট এবং দুই সিপাহি নিহত হয়। পরে ইংরেজ বাহিনী তাঁকে বন্দি করে। ১৮৯৪ সালে তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে কারারুদ্ধ রাখে। ১৮৯৬ সালে জেলের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- ইজরায়েলের আয়তন ২১ হাজার ৯৩৭ বর্গ কিলোমিটার।
- ইজরায়েলের জনসংখ্যা ৯৪ লক্ষেরও কম।
- ইজরায়েলের প্রত্যেক নাগরিক এক-একজন সৈনিক।
- ইজরায়েলে সেনাবাহিনীতে মহিলাদের যোগদান বাধ্যতামূলক।
- ইজরায়েল বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে সেনাবাহিনীতে নারী-পুরুষকে সমান হিসেবে গণ্য করা হয়।
- ইজরায়েলের অর্থনৈতিক অবস্থান খুবই শক্তিশালী।

ভালো কথা

সাফাই অভিযান

এবার মহালয়ার দিন থেকে আমাদের পাড়ায় সাফাই অভিযান শুরু হয়েছে। লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত চলেছে। প্রতিদিন সকালে পাড়ার সবাই মিলে ঝাঁটা, কোদাল, ঝুড়ি, দা নিয়ে যেখানে যা আবর্জনা সব পরিষ্কার করে গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। পূজামণ্ডপে কেউ যাতে কোনো আবর্জনা না ফেলে তার জন্য কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পূজা কমিটি আগেই বলে দিয়েছিল, কোনো রকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহার করা যাবে না। চকোলেট বা টফির কাগজও ফেলা যাবে না। লক্ষ্মীপূজার পরদিন রামুর ঠাকুমা বলেছিল, শুধু পূজা উপলক্ষ্যে সাফাই অভিযান না করে সারা বছর করলে খুব ভালো হয়।

বিবেক সরদার, নবম শ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

টিয়াপাখি

ঐন্দ্রি মহান্ত, দ্বিতীয় শ্রেণী, নুড়াইপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম।

টিয়াপাখি টিয়াপাখি
অমন সবুজ জামা,
বল না তোকে কে দিয়েছে
আছে কি তোর মামা?

গলায় ফিতে কে দিয়েছে
টুকটুকে লাল ঠোঁটে
সঙ্গীসাথী কাছে এলে
দিব্যি কথা ফোটে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

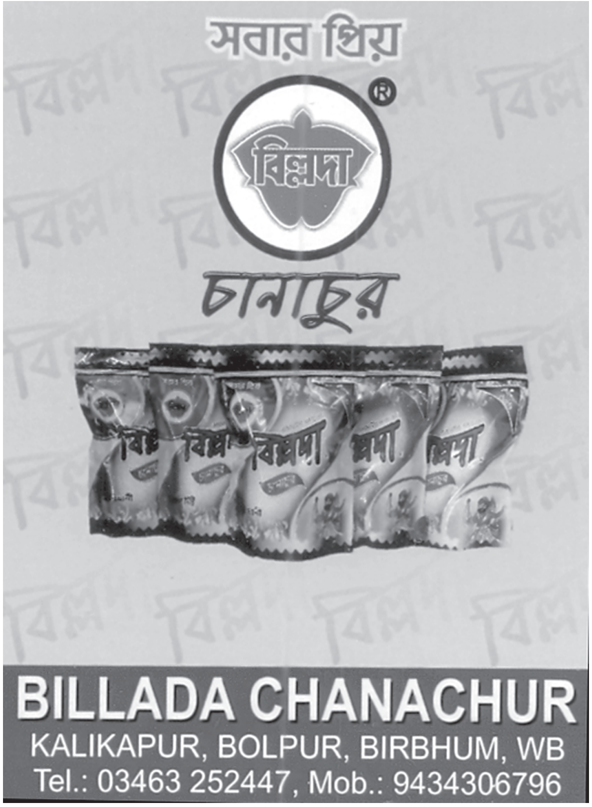

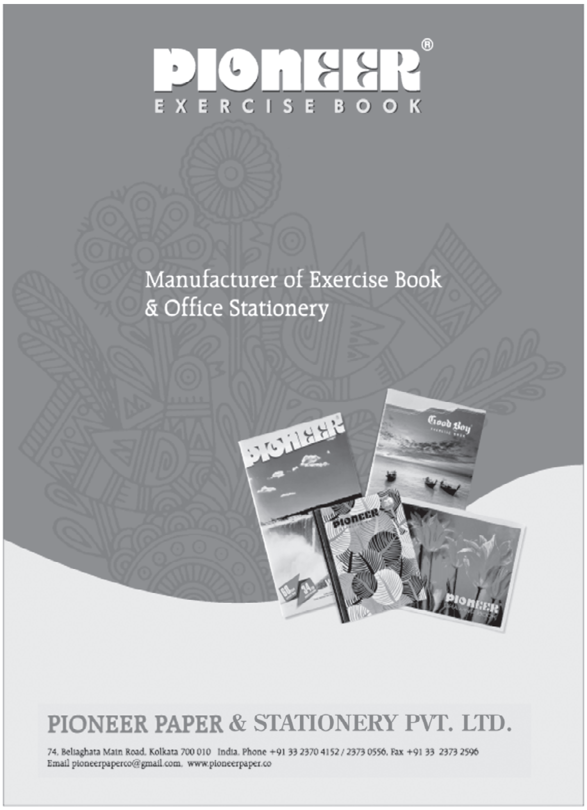

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

হিন্দু ধর্মের বলিষ্ঠ সংস্কারক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

রবি রঞ্জন সেন

গত এক সহস্রাব্দ জুড়ে বিদেশি আক্রমণের যে ঢেউ ভারতের উপর আছড়ে পড়ে তার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র লুঠ বা শাসন কায়েম নয় বরং এদেশের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতিনীতিকে সমাপ্ত করে বিজাতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি আমাদের দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া। তুর্কি-পাঠান-মুঘল শাসনকালে ধ্বংসলীলার স্বীকার হয় এদেশের মঠ-মন্দির-বিগ্রহ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে ইউরোপীয় বণিকরাজ্য তৈরি হয় সেখানে আক্রমণের কৌশল পরিবর্তিত হয়। ইংরেজ রাজত্বে বলপূর্বক ধর্মান্তরণের পরিবর্তে সুকৌশলে হিন্দুদের শিক্ষা, মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনা পরিবর্তন করে শেষমেশ সেই ধর্মান্তরণেরই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়। অপরদিকে দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের মধ্যে যে স্থবিরতা এবং বিভিন্ন ধরনের ভেদাভেদ ও কুপ্রথা প্রচলিত ছিল তার পরিণামস্বরূপ নতুন বৌদ্ধিক আক্রমণের মুখে হিন্দু সমাজ অনেকটাই বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত দেখা দিল। সে যুগের খ্রিস্টীয় মিশনারিরা আত্মবিশ্বাসী ছিল যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গেই শিক্ষিত শ্রেণী দেশীয় ধর্ম পরিত্যাগ করবে এবং খ্রিস্টমত গ্রহণ করবে। তারা বিভিন্ন প্রতিবেদনে লেখে যে সনাতন ধর্মের অবলুপ্তি ও ভারতের খ্রিস্টানীকরণ কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা!

কিন্তু এই প্রত্যয়ে বাধ সাধলেন তিনজন মনীষী যাঁরা হিন্দুধর্মের মূলকে অটুট রেখে বাহ্যিক আবরণগুলির আমূল পরিবর্তনের ডাক দিলেন— শতাব্দীর গোড়ায় রাজা রামমোহন রায়, মধ্যভাগে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং শেষপ্রান্তে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনজনের মত-পথ- কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল কিন্তু তিনজনেরই কাজের দিশা একটিই ছিল— হিন্দুধর্মের সার সত্যকে নতুন করে তুলে ধরা, তাকে যুগোপযোগী করা এবং বাহ্যিক আক্রমণগুলি মোকাবিলা করার মতো সামর্থ্য তৈরি করা। সেযুগের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আজ যে বৈদিক হিন্দুধর্ম সগর্বে সমহিমায় বিরাজ করছে ও বহির্বিশ্বে বিস্তার লাভ করছে তা অনেকাংশে এই মানুষদের জন্য।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি বর্তমান গুজরাটের কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চলে একটি সামবেদীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কৃষণজী লালজী ছিলেন নিষ্ঠাবান শৈব। বালক মূলশঙ্কর (দয়ানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) শৈশব থেকেই বেদমন্ত্র ও বেদভাষ্যের অংশ মুখস্থ করতেন। আট বছর বয়সে তাঁর বাবা তাঁকে মন্দিরে একা বসিয়ে রেখেছিলেন এমন সময়ে তিনি দেখলেন কয়েকটি ইঁদুর শিবলিঙ্গের উপর চড়ে নৈবেদ্য খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে প্রতীকোপাসনায় তিনি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং মনে করেন যে লিঙ্গ বা মূর্তি পূজা করা অর্থহীন। এই ঘটনার পর আসল সত্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে তিনি আরও মন দিয়ে বেদ ও বেদাঙ্গের অধ্যয়ন শুরু করেন। পরিবারে কয়েকটি মৃত্যু দেখে তিনি জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত চিন্তায় মগ্ন হলেন। এই সমস্ত লক্ষণ দেখে তাঁর পিতা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর বিবাহ ঠিক করেন কিন্তু ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে একুশ বছর বয়সে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করেন।

বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ ও সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গলাভ করে নর্মদার তীরে স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতীর কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন। কিছুকাল কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের পর অবশেষে মথুরায় এসে প্রসিদ্ধ সাধক স্বামী বিরজানন্দের সাক্ষাৎলাভ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দৃষ্টিহীন সন্ন্যাসী বিরজানন্দ দস্তীশ তাঁর প্রবল পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং তিনি দয়ানন্দকে তাঁর পুস্তকসম্বল যমুনার জলে নিক্ষেপ করে নতুনভাবে অধ্যয়ন শুরু করার নির্দেশ দিলেন। একাশি বছরের বৃদ্ধ বিরজানন্দ যেন এই শিষ্যের জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিলেন এবং তাঁর সমস্ত বিদ্যা উজাড় করে তিনি পাণিনির ব্যাকরণ, বেদ, বেদান্ত, মনুস্মৃতি, ব্রহ্মসূত্র, ষড়দর্শন প্রভৃতি তাঁকে পড়ালেন। দয়ানন্দও সেইমতো নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুরুর চরণে সমর্পণ করলেন এবং গুরুর উপদেশের মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের দিশা খুঁজে পেলেন। ছত্রিশ বছরের যুবক দয়ানন্দকে বিরজানন্দ বোঝালেন কীভাবে ভারতের অপৌরুষেয় শ্রুতিশাস্ত্র বেদের অবহেলার কারণেই দেশের পতন আর সেই পতনেরই লক্ষণ আগাছারূপী কুসংস্কারসমূহ। গুরুদক্ষিণা হিসাবে তিনি দয়ানন্দের কাছে প্রতিশ্রুতি চেয়ে নিলেন— যে তিনি আর্যাবর্তের পবিত্র শ্রুতিশাস্ত্রের মহিমা প্রচার করবেন, মনুষ্যসৃষ্ট সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে খণ্ডন করবেন এবং ভারতে বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন।

ছ' বছর গুরুর নিকট শিক্ষালাভের পর দয়ানন্দ হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় পদার্পণ করেন। হিন্দুধর্মের এই সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশে ১ মার্চ ১৮৬৭ নিজের কুটিরের সামনে 'পাখণ্ড মণ্ডনী পতাকা' উত্তোলন করে গুরুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকৃত বৈদিক ধর্মপ্রচারের কার্যারম্ভ করেন। তাঁর প্রদত্ত ধর্মব্যাখ্যায় তিনি প্রচার করেন যে প্রাচীন বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না ফলে হিন্দুধর্মে প্রতিমা উপাসনা পরবর্তীকালের সংযোজন, বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য যার দূরীকরণ প্রয়োজন। তিনি বৈদিক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে করতেন বেদে উল্লেখিত বিভিন্ন দেবতা সেই একই ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশমাত্র। তিনি বৈদিক যজ্ঞকেই হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের মূল ভিত্তি বলে মনে করেন। অপরদিকে তিনি আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা, মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োগ, ভয়ভীতি দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রভৃতিকে কুসংস্কার

ফ ঃ ৬

বলে মনে করতেন। তিনি জন্মগত জাতিবর্ণের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং মনে করতেন যে কেবলমাত্র কর্ম অনুযায়ী বর্ণবিন্যাসই প্রকৃত বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম। এই মত অনুসারেই তিনি সমস্ত হিন্দুর যজ্ঞোপবীতে অধিকার এবং বেদপাঠ ও বৈদিক যজ্ঞে অধিকারের কথা বলেন। স্বাভাবিকভাবেই সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণীর এই কথাগুলি পছন্দ হতো না এবং তাঁরা স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে ঘোর বিতর্কে লিপ্ত হতেন। তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হতো। বারাণসীতে কাশী নরেশের উদ্যোগে রাজপণ্ডিত তারাচরণ তর্কালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রার্থ খুবই বিখ্যাত যেখানে শতসহস্র মানুষ শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন। ক্রমাগত পরিব্রাজন এবং শাস্ত্রার্থের মাধ্যমে তিনি বলিষ্ঠভাবে তাঁর মত প্রচার করতেন যার ফলে নানা স্থানে বহু মানুষ তাঁর মতের অনুগামী হয়ে ওঠে। প্রয়াগে মহাদেব প্রসাদ নামক এক ব্যক্তিকে তিনি হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তাঁকে খ্রিস্টমতে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

১৮৭২-এর শীতকালে স্বামী দয়ানন্দ কলকাতা আসেন এবং মহারাজা জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাগানবাড়িতে তাঁর আবাসের ব্যবস্থা হয়। কলকাতার বিভিন্ন নামি ব্যক্তিরা এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন— যাঁদের মধ্যে ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৯ জানুয়ায়ী কেশবের আমন্ত্রণে তিনি তাঁর গৃহে গিয়েছিলেন যেখানে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং তিনি সংস্কৃতে ভাষণ প্রদান করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যান এবং সেখানে প্রকৃত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোচনা হয়। ঠাকুরবাড়ির উঠানে বেদীর চারপাশে উপনিষদ-বাক্য খচিত দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। কলকাতায় দয়ানন্দ তিন মাস যাপন করেন যে সময় তিনি ধর্মবিষয়ক বেশ কয়েকটি ভাষণ প্রদান করেন। হুগলীতেও তাঁর ভাষণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ভাটপাড়ার পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বারাণসীতে স্বামী দয়ানন্দ একটি বৈদিক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুম্বইতে তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর দিল্লি, লাহোড়, মীরট, বর্তমান রাজস্থান প্রভৃতি পরিভ্রমণ করে সেখানেও আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০-তে উদয়পুরে মহারাজার সঙ্গে দেখা করেন এবং সেখানে আর্য সমাজ ছাড়াও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে 'পরোপকারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার আর্য সমাজ ছাড়াও তিনি 'গোরক্ষিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে যোধপুরের মহারাজার আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান এবং ধর্মবিষয়ক দীর্ঘ আলোচনায় মহারাজা অনুপ্রাণিত হয়ে আর্য সমাজের কাজের জন্য বিপুল আর্থিক অনুদান করেন। কিন্তু যোধপুরে পাঁচ মাস অতিবাহিত করার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বলা হয় যে সেখানকার কিছু ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর খাদ্যে বিষ মেশানো হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসার জন্য মহারাজা যথাসম্ভব চেষ্টা করলেন কিন্তু শুশ্রূষার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে ৩০ অক্টোবর ১৮৮৩, ঊনষাট বছর বয়সে এই তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসী ও সমাজ সংস্কারক মর্ত্যলোক ত্যাগ করেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) তাঁর বিরামহীন ধর্মপ্রচার, শাস্ত্রার্থ, ব্যাখ্যান ও লেখার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে জাগরণ ঘটান। কংগ্রেসের অনেক আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত ভারতীয়দের জন্য। পরবর্তী প্রজন্মের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারকদের উপর তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। লালা লাজপত রায় নিজেকে 'দয়ানন্দের মানসপুত্র' বলেছেন। লালা হরদয়াল, পণ্ডিত লেখরাম, ম্যাডাম কামা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ভাই পরমানন্দ, মহাত্মা হংসরাজ, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রমুখ স্বামী দয়ানন্দের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

দয়ানন্দের রচনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'সত্যার্থ প্রকাশ' যার মধ্যে তাঁর মৌলিক চিন্তাগুলি প্রকাশ পেয়েছে এবং পরবর্তীকালে বহু মানুষকে প্রভাবিত ও আন্দোলিত করেছে। এছাড়াও তাঁর অসম্পূর্ণ বেদভাষ্য, এবং 'আর্য উপদেশ রত্নমালা', 'সংস্করণ বিধি' প্রভৃতি পুস্তক তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। গোরক্ষা ও গোহত্যা বন্ধ তাঁর কাছে ভারত এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের অঙ্গ ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি 'গৌকরুণানিধি' নামক পুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় ভাষা রূপে হিন্দি অবলম্বনের আহ্বান করেছিলেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজের আহ্বান ছিল 'Back to the Vedas' অর্থাৎ বৈদিক শিকড়ে প্রত্যাবর্তন এবং এই সমাজের মূলমন্ত্র ছিল, 'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্'— অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম ও জ্ঞান কেবলমাত্র ভারতীয়দের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এই ভাবে স্বামী দয়ানন্দ হিন্দুধর্মকে সবরকম সংকীর্ণতা থেকে মক্ত করে তাকে বিশ্বজনীন আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠার একজন অগ্রদূত ছিলেন। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার বর্জনের যে আহ্বান তিনি করেছিলেন তাতে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ এই আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। সমাজ সংস্কার, বিধবাবিবাহ, সামাজিক সমরসতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, হিন্দুত্বের আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, এই সকল ক্ষেত্রে স্বামী দয়ানন্দের আদর্শ এবং আর্য সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হিন্দুধর্মের এক কুপ্রথামুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক বিকল্পকে সামনে রাখার ফলে শিক্ষিত শ্রেণীর ধর্মান্তরণের প্রবণতা রোধ হয়। আবার মধ্যযুগে ধর্মান্তরিত অংশকে ফিরিয়ে আনার জন্য দয়ানন্দের আদর্শ অনুসরণ করেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে 'শুদ্ধি আন্দোলন' শুরু হয়। 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক স্কুল' ও গুরুকুল গড়ে তুলে আর্যসমাজ দেশবাসীকে বিশেষত নারীসমাজকে আধুনিক যুগোপযোগী অথচ স্বদেশি ভাবনায় গ্রথিত শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছিল যা আজও চলমান।

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে দয়ানন্দের মতকে যদিও বৃহত্তর হিন্দু সমাজ গ্রহণ করেনি তবে আজও যখন জাতিভেদ ও জাতিবৈষম্য বিদ্যমান তখন প্রত্যেক হিন্দুর বৈদিক জ্ঞান ও বৈদিক কর্মকাণ্ডে সমানাধিকারের আদর্শ ততটাই প্রাসঙ্গিক। তাঁর এই মহৎ আদর্শ অনুসরণ করে আর্য সমাজ আজও জাতি-জন্ম-কুল নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও বেদপাঠ, যজ্ঞ ও পৌরোহিত্যের অধিকার প্রদান করেন। এই পথেই সমগ্র হিন্দু সমাজের একতা, সংহতি ও শক্তি সঞ্চয় সম্ভব। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর দ্বিশতবার্ষিকী বর্ষে, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁর নিষ্ঠা, তেজ এবং নির্ভীক বলিষ্ঠ বার্তা আজও অনুপ্রেরণা প্রদান করছে। □

বিশ্ব শান্তির স্বার্থেই জেহাদি হামাসকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে

মন্দার গোস্বামী

আক্রান্ত ইজরায়েল, রক্তাক্ত ইজরায়েল। গত ৭ অক্টোবরের সকালে পবিত্র উৎসব সিমখাট টোরা পালনে যখন ইজরায়েলিরা ব্যস্ত। চতুর্দিকে গান বাজনা-সহ উৎসবের আমেজ। তখনই নৃশংস ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন হামাসের নেতৃত্বে ইজরায়েলের উপর শুরু হলো অতর্কিত আক্রমণ। মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রায় ৫০০০ রকেট উৎক্ষেপণ করে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা আয়রন ডোমকে সাময়িক বিভ্রান্ত করে দেওয়া হলো। হামাসের হাজার হাজার 'ইজ আদ্দিন আল কাসাম' বিগ্রেডের ইসলামিক জঙ্গিরা প্যারাগ্লাইডিং করে জলপথে, স্থলপথে ঢুকে পড়লো দক্ষিণ ইজরায়েল ভূখণ্ডে। শুরু হলো আনন্দে মশগুল নিরস্ত্র নিরীহ ইজরায়েলিদের ওপর যথেচ্ছ গুলি বর্ষণ। বিদেশিরাও বাদ গেল না। অনেককে অপহরণ করা হলো। সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে দেখল— মৃত, রক্তাক্ত, নগ্ন ইজরায়েলি তরুণীর দেহের ওপর বর্বর হামাস জঙ্গিদের থুতু বর্ষণ, শিশুদের ওপর নৃশংস পাশবিক অত্যাচার, তাদের পিতা-মাতার করুণ আর্তির ফেসবুক লাইভ। বিশেষ কিছু সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, বয়স্ক মানুষ ও শিশুদের গাজার রাস্তায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে হামাস জঙ্গিরা। যদিও নৃশংসতার সব ঘটনা খবরে আসছে না। তবুও এটা পরিষ্কার যে, স্থান-কাল যাই হোক না কেন, ইসলামিক জেহাদিদের চরিত্র সর্বত্রই এক। হারকাত আল মুকাওয়ামা আল ইসলামিয়া, সংক্ষেপে 'হামাস', এক কথায় ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন। ১৯৮৭ সালে মিশরীয় ইসলামিক ব্রাদারহুডের

একটি শাখা রূপে গাজা ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় হামাস। এর কাজই ছিল চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে ইজরায়েলকে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করা। ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তি অনুযায়ী, ইজরায়েল গাজা ভূখণ্ডের উপর 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের' প্রধান ইয়াসের আরাফাতের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের স্বশাসন মেনে নেয়। প্যালেস্টাইন ইজরাইলের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়। হামাস এই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে। মুখে ইসলামিক ব্রাদারহুডের কথা বললেও, হামাস পিএলও-র রাজনৈতিক শাখা ফাতাহকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্য নিয়ে রক্তক্ষয়ী আক্রমণ শুরু করে।

আরাফাতের মৃত্যুর পর ফাতাহ আরও দুর্বল হয়ে পড়লে, গাজায় অবস্থিত ফিলিস্তিনিদেরও মানসিকতার পরিবর্তন হয়। তারা উদারপন্থী ফাতাহকে পরিত্যাগ করে বর্বর জঙ্গি সংগঠন হামাসকে বরণ করে নেয়। ২০০৬ সালের ফিলিস্তিনি পার্লামেন্টের সংসদীয় নির্বাচনে অধিকাংশ আসনই জেতে হামাস। এরপর ফাতাহর নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্বিচারে কোতল করে ক্ষমতায় আসে এই জঙ্গি সংগঠন। হামাস ইজরায়েলের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। সভ্য সমাজের বিরোধী জেহাদি এই সংগঠনটি কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তিও

মানে না। তাদের একটাই লক্ষ্য, ইজরায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এ ব্যাপারে তাদের মদত দেয় আরবের বেশ কিছু দেশ। তারাও স্বাধীন ইজরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জন্মের সময় থেকেই ইজরায়েলের ওপর একের পর এক ইসলামি আক্রমণ অব্যহত। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন ইজিপ্টের নেতৃত্বে জর্ডন, সিরিয়া, ইরাকের সৈন্য বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ইজরায়েলের ওপর। যুদ্ধ স্থায়ী হলো মাত্র ছ'দিন।

ইজরায়েলের হাতে মার খেয়ে মাত্র ছয় দিনেই আরব দেশগুলি রণে ভঙ্গ দিল। ১৯৭৩-এর ৬ অক্টোবর ইহুদিরা তাদের পবিত্রতম উৎসব 'ইয়ম কিপ্পুর' উৎসবে যখন ব্যস্ত, তখন আটটি আরব দেশ একযোগে আক্রমণ করে ইজরায়েলকে। কিন্তু ইহুদিদের রামঠেঙানি খেয়ে মাত্র ২০ দিনেই নাক-কান মূলে তোবা কবুল করে নতজানু হতে বাধ্য হয় আরব দেশগুলি। সেই ইহুদি যাদের এক সময় কোনও দেশ ছিল না, নিজস্ব ভূখণ্ড ছিল না। কিন্তু তারা স্বপ্ন দেখেছিল নিজস্ব দেশের, নিজস্ব ভূখণ্ডের। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে দেখা হলেই তারা পরস্পরকে বলতেন 'নেক্সট ইয়ার ইন জেরুজালেম' অর্থাৎ পরের বছর আমরা সবাই জেরুজালেমের একত্রিত হব, আমাদের নিজস্ব দেশ হবে। অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং প্রবল প্রচেষ্টার কারণে ১৯৪৮-এর ১৪ মে স্বাধীন ইজরায়েলের জন্ম হয়। ভারতের স্বাধীনতার প্রায় এক বছর পর। বর্তমান জাতি সংঘের ১৯২টি সদস্য দেশের মঝ্যে ১৬৪টি দেশ ইজরায়েলকে স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি দিলেও মিশর, জর্ডন বাদে ২৮টি ইসলামিক দেশ এখনও ইজরায়েলের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়নি। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করলেও ইজরায়েল ধ্বংসের এই একটি ব্যাপারে কিন্তু সকলেই একমত। ইতিহাসের বিড়ম্বনা এই যে, উদারবাদী তুরস্ক সর্বপ্রথম ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই তুরস্কের বর্তমান শাসক এরদোগান হামাসকে অর্থ অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, রকেট সরবরাহ করছে। সাহায্যকারীর তালিকায় রয়েছে— সিরিয়া, ইয়েমেন, লেবানন, কুয়েত, কাতার। পাকিস্তান, ইরান তো খোলাখুলি হামাসের নৃশংস আক্রমণকে সমর্থন করছে। বাংলাদেশ আবার দুকাঠি ওপরে, তাদের নাগরিকদের কেউ ইজরায়েলে গেলে, দেশে ফেরার পর অনিবার্য কারাবাস। বাংলাদেশে ইজরায়েলি পাসপোর্ট নিষিদ্ধ। তাই বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশের মনোভাব কী হতে পারে। হামাসের আক্রমণের কারণে বিশ্বের অনেক ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন উজ্জীবিত।

লেবাননের জঙ্গি হেজবুল্লাহ বাহিনী তো হামাসের হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। হামাস এবার যেভাবে আটঘাট বেঁধে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করেছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আন্তর্জাতিক প্যান ইসলামিক ষড়যন্ত্রের ইন্ধন রয়েছে। তবে হামাসের আক্রমণ বেশিদিন টিকবে না। অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও ইজরায়েল বীরবিক্রমে শুরু করেছে পালটা 'অপারেশন আয়রন সোর্ড'।

হামাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলি নাগরিকদের প্রায় সকলকেই সৈন্য প্রশিক্ষণ নিতে হয়। ব্যবসা, অফিস কাছারি, কলেজ, ছেড়ে দলে দলে ইজরায়েলিরা দেশ রক্ষায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করছে। এমনকী বিদেশ থেকেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে প্রচুর ইজরায়েলি নাগরিক দেশে ফিরে হামাসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। জেহাদি ইসলামিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আজ সব ইজরায়েলি নাগরিকই সঙ্ঘবদ্ধ, এককাট্টা। রাষ্ট্র চেতনার এই মানসিকতাই আজ ইজরায়েলকে জান-বিজ্ঞানে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে। জেহাদি ইসলাম যাকে ধ্বংস করতে চায়।

ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বক্তব্য, 'যুদ্ধ শুরু করেছে ওরা, শেষ করব আমরা'। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমাদের আর কোনও উপায় নেই, নরপশুরা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই ওদের জবাব দেব'।

ইজরায়েলের বিমান হানায় একের পর এক গুঁড়িয়ে যাচ্ছে হামাসের আশ্রয়স্থল। প্রচুর হামাস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। তারা এখন গাজার জনবসতিতে মিশে হাসপাতাল ধর্মস্থান থেকে রকেট ছুঁড়ছে। উদ্দেশ্য একটাই ধর্মস্থানে, জনবসতিতে, হাসপাতালে বিমান হানায় 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' হলে বিশ্বজুড়ে যাতে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠবে। এতে তারা কিছুটা সফলও হয়েছে। হামাসের বর্বরোচিত আক্রমণের সময় যারা মুখে সেলোটেপ এঁটে ছিল, মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে তারাই এবার জেগে উঠেছে।

আমাদের দেশেও জেহাদি তোষণকারী দলগুলি যথারীতি মাঠে নেমে পড়েছে। মোমবাতি, ফেস্টুনের খোঁজ চলছে। সামনেই তো আবার ভোট। সভ্য সমাজে হামাসদের কোনও স্থান থাকতে পারে না। বিশ্ব শান্তির স্বার্থেই হামাসদের ঝাড়েবংশে নির্মূল হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে অতি কঠোর হতে হবে। সভ্য দেশের অধিকাংশই আজ ইজরায়েলের পাশে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দ্বিধাহীনভাবে ইজরায়েলের পাশে ভারতের বার্তা দিয়েছেন। ইজরায়েলি সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের সনাতন সংস্কৃতির অনেক মিল রয়েছে। ভারতও বারবার আক্রান্ত হয়েছে। জেহাদি শক্তি আজও আমাদের দেশকে, কাফের গণ্য করে আমাদের দেশ ধর্ম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চায়। হামাসের আক্রমণের কারণে প্রতিবেশী দেশ তো বটেই আমাদের দেশেও জেহাদি জঙ্গি স্লিপার সেলগুলি উজ্জীবিত হয়েছে। এদের একটাই লক্ষ্য যেনতেনপ্রকারেণ ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। আমরা ঘরপোড়া গোরু, তাই সাধু সাবধান। □

কামদুনির রায় বুঝিয়ে দিল দুধেল অপরাধীরাই এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

বাঙ্গালি আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই জিজ্ঞাসা করছি, কামদুনির সেই ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটির কথা মনে পড়ে? না, সবাই তাঁকে ভুলে গেছেন? এই যে, কামদুনির কলেজে পড়া যে মেয়েটিকে কতগুলো দুধেল জন্তু ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। সেই হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত জন্তুদের নিম্ন আদালতে কারও সাজা হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, কারও সাজা হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড! কিন্তু নিম্ন আদালতের সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট গিয়েছিল অপরাধীরা। সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে সেই অপরাধীদের অপরাধকে লঘু করে সাজা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন মুক্তিও পাবে।

২০১৩ সালের জুন মাসে রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনিতে ওই কলেজ ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় হলো পৃথক ফল। এই মামলায় নিম্ন আদালতে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত তিনজনের মধ্যে দু'জনকে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। অন্যজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একইভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত জিনজনের সাজা কমিয়ে সাত বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই চারজন জেলে দশবছর কাটিয়ে দিয়েছে, তাই তাদের মুক্তির পথ খুলে গেল।

সেই রায় বেরোনোর পর ভেঙে পড়েছেন মৃতার পরিবার, বন্ধু, সহমর্মীরা এবং সারা কামদুনি। টুম্পা কয়ালের মা কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'মেয়ের মাসিকের কাপড়টাই ওরা মুখে গুঁজে দিয়েছে।' টিভিতে টুম্পা ও মৌসুমির কান্না দেখে ভীষণ মন খারাপ হচ্ছিল। ওই দুই মহিলার যা সৎসাহস আছে, তা ভাতাজীবী বাঙ্গালির নেই। যদি থাকত তাহলে রায় ঘোষণার পরেই রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ হতো পুলিশ ও সিআইডির দপ্তর ঘিরে। কেননা আদালতে বিচারকেরা বিচার করেন তদন্তকারী অফিসারের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে।

এক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারেরা হয়তো কারও দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিষয়টিকে লঘু করে দেখানোর জন্যই বিচারকের কাছে সাজার গুরুত্ব কমে গেছে। এতবড়ো একটি ঘটনা যা দিল্লির সেই নির্ভয়া কাণ্ডের পর আদালত বলেছিলেন— 'বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা।' কামদুনির ঘটনাও সেইরকম বিরলতম হওয়া সত্ত্বেও মৃতা এখানে সুবিচার পেলেন না; এই রায় কামদুনিবাসী কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে যে দুই আইনজীবী বিনামূল্যে মামলা লড়েছিলেন, তাঁরাও বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'দিল্লির নির্ভয়া বিচার পেলেও কামদুনির মেয়েটি বিচার পেল না।'

নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, প্রথম থেকেই প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। কেন এই মামলায় ১৬ বার সরকারি আইনজীবী বদল করতে হলো, সেটাও রহস্যের। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, কিছু বিশেষ মামলায় রাজ্যের তরফে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ করা হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তা হয়নি।

অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা এবং পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকার তুলনা করছেন উত্তরপ্রদেশের পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে। এরাজ্যের ফাঁসির আসামিরা বেকসুর খালাস পাচ্ছে। সিআইডি, পাবলিক প্রসিকিউটর থেকে সিস্টেম সবই নাকি বিক্রি হচ্ছে টাকার বিনিময়ে। অথচ যোগীরাজ্যে যে কোনো অপরাধের বিশেষ করে ধর্ষণকাণ্ডে অপরাধীরা আদালতে হাজিরা দিত ঠিকই কিন্তু আদালত থেকে ফেরার সময় হাসপাতালে হয়ে সোজা মর্গে। এ রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ধর্ষক, খুনিরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামিও বেকসুর খালাস হয়ে যাচ্ছে। এ বড়ো কলঙ্কের, এ বড়ো লজ্জার।

আইন হাতে তুলে নেওয়াটা ঠিক নয়। এছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে আর করবারই-বা কী আছে? প্রশাসন থেকে বিচারব্যবস্থা, মানুষ আর সেখানে ভরসা রাখতে পারছে না। যত দ্রুত সম্ভব এই সিস্টেমের আমূল সংস্কার প্রয়োজন, না হলে খুব দেরি হয়ে যাবে। আগামীদিনে আরও বুক ফুলিয়ে দুধেল জন্তুরা ঘুরে বেড়াবে প্রকাশ্য দিবালোকে আর পরিবারের সকলের সামনে থেকে মেয়েদের তুলে নিয়ে যাবে। কারণ তারা জানে তাদের কোনো কঠিন শাস্তি হবে না।

হাইকোর্টের রায়ের পর কামদুনি ফের ফুঁসে উঠেছে। আন্দোলনে পথে নেমেছেন টুম্পা, মৌসুমিরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অনেকে। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নেতারাও তাতে যোগ দিয়েছেন, যোগ দেননি কেবল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। উলটে তাঁরা বিরোধীদের কটাক্ষ করছেন। সিআইডি যদিও এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে যাওয়ার কথা বলেছে তবুও কামদুনির মানুষ সিআইডির ওপর ভরসা রাখছেন না। তাঁরা সিবিআই তদন্ত চাইছেন, কারণ সিআইডির দয়াতেই তো হাইকোর্টের এই রায়। তাই তাঁরা নিজেরাই সুপ্রিমকোর্টে যেতে চান।

আজ প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও মেয়েদের লাভ জেহাদ, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। সংবেদনশীলতার পরিবর্তে নিরাপত্তাহীনতা ও অসহযোগিতা এ রাজ্যে মেয়েদের ক্রমশই গ্রাস করছে। এই বিভীষিকা এবং নৈরাজ্য থেকে কবে মুক্তি পাব আমরা? কামদুনির রায় বুঝিয়ে দিল দুধেল অপরাধীরাই এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ। □

ধর্ম ও দেশ রক্ষায় শাস্ত্র ও শস্ত্র : প্রসঙ্গ ইজরায়েল

সুশান্ত মজুমদার

শাস্ত্র, শস্ত্র ও অস্ত্র— তিন সম্পদে পরিপূর্ণ ইজরায়েল দেশ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে সারা বিশ্বে। সারা বিশ্বের উন্নত জাতিসত্তা যে দেশেই নির্মাণ হয়েছে, সেটা এই তিনের ওপর ভিত্তি করেই। শুধু জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে বসে থাকলে সেই শাস্ত্রজ্ঞানকে রক্ষা করা যাবে না। কারণ আপনার দেশ রক্ষা না পেলে আপনার শাস্ত্র জ্ঞান ও রক্ষিত হবে না। তাই আগে দেশ রক্ষা করতে হবে। তার জন্যে দরকার অস্ত্র ও শস্ত্রের সুরক্ষা। ইহুদি জাতি সারা বিশ্বে হাজার হাজার বছর ধরে বিতাড়িত হয়ে, অত্যাচারিত হয়ে এই সত্য অনুধাবন করেছিল ১৯৪৮ সালে নিজেদের দেশ ইজরায়েল গঠনের পরে পরেই। তাই তারা 'ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ' সনাতন এই পবিত্র বাণী ইহুদিরা তাদের দেশ ও ধর্ম রক্ষায় মেনে চলছে। যেটা অনুধাবন করেনি বৌদ্ধ জ্ঞানীদের দেশ তিব্বতের তিব্বতীয় বৌদ্ধরা অথবা মেধাবী পারস্যর ঐতিহাসিক দেশ পার্সিয়ার (বর্তমান ইসলামিক দেশ ইরান) অগ্নি উপাসক পার্সিরা। তাই কমিউনিস্ট চীনের আগ্রাসন থেকে তিব্বত শুধু নিজেদের জ্ঞান ও মেধা দিয়ে নিজেদের দেশ রক্ষা করতে পারেনি। সেইরকম রতন টাটার পূর্বপুরুষের দেশ পারস্য ও ইসলামি আগ্রাসন থেকে রক্ষা পায়নি শান্তির বাণী আঁকড়ে থেকে বা নিজেদের উচ্চ মেধা নিয়ে বসে থেকে।

ইজরায়েলের ইহুদিরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই শুধু নিজেদের মেধা, জ্ঞান ও পরম্পরার ঐতিহ্য নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে না থেকে নিজের দেশকে অস্ত্র ও শস্ত্রে রক্ষা কার জন্যে প্রস্তুত করেছে বিগত কয়েক দশকে। তাই সারা বিশ্বে ইহুদি মেধা, ধনসম্পদ, প্রযুক্তি শুধু নিজের দেশের কৃষি, বাণিজ্য, গবেষণা, উন্নয়ন নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইহুদিরা দেশের সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা নিয়েও সমান শ্রেষ্ঠত্ব তৈরি করেছে। সেই জন্যেই সারা বিশ্বের ইসলামি দেশগুলো একসঙ্গে বিগত ৭০ বছর ধরে ইহুদিদের বিরোধিতা ও আক্রমণ করে গেলেও ইজরায়েল তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে দেয়নি। সে সারা পৃথিবীর এক শক্তিশালী জাতিসত্তা নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেটা পারেনি বৌদ্ধ তিব্বতিরা, পারেনি পার্সিরা। তাই পার্সিদের কোনো দেশ নেই। তিব্বতের ঐতিহ্যও আজ প্রায় শেষ।

ইজরায়েল যদি গত ৭০ বছর যুদ্ধ না করে শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও তাদের মেধা নিয়ে অহংবোধ ও উদাসীনতা নিয়ে থাকতো তাহলে তাদের পরিণতি আজ পার্সি বা তিব্বতিদের মতো হয়ে যেত। যে প্যালেস্টাইন নিয়ে এখন অনেক মানুষ 'শান্তির বাণী' ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা কি নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শান্তির কথা ভেবেছে আদৌ! না ভাবেনি। তাই পাকিস্তানের মতো তারাও রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সমাধান সূত্রের বদলে বিগত ৭০ বছরে নিজেদের দেশে উগ্রপন্থী সংগঠনের আধিপত্য কায়েম করেছে। হামাস থেকে হিজবুল্লাহ সব জয়ী সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে প্যালেস্টাইন। যাদের উসকানিতেই গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে তারা নারকীয় বর্বরতা ও হিংস্র আক্রমণ করেছে। তার প্রতিরোধ করছে এখন ইজরায়েল। নিজের জাতির অস্তিত্ব রক্ষায়, নিজের মাতৃভূমি রক্ষায় সারা পৃথিবীর ইহুদি এক সূত্রে গাঁথা। ইহুদি চাষী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দল সবাই এখানে এক বাক্যে নিজের মাতৃভূমি রক্ষায় যুদ্ধে অবতীর্ণ। ইহুদি বিজ্ঞানী ল্যাবরেটরির পরীক্ষা ছেড়ে বন্দুক ধরেছে, ইহুদি শিক্ষক তার ক্লাসরুম ছেড়ে আইডিএফ (ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স)-এ যোগদান করে। ব্যবসায়ী বা প্রধানমন্ত্রী সবার পুত্র-কন্যা দেশের জন্যে উৎসর্গ করে নিজের প্রাণ।

নিজেদের আত্মরক্ষার বলয় তৈরি না করে, নিজেদের উপযুক্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চা করে ভারতের নালন্দা, বিক্রমশিলা, তক্ষশীলা, সারদা বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষা পায়নি। আক্রমণকারী ও ধ্বংসকারী শক্তি নিরীহ, জ্ঞানী বা শান্তিকামী মানুষকেও রেয়াত করেনি। তাই আর্কিমিডিস বা নালন্দার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সবাইকেই আক্রমণকারীদের হাতেই নিহত হতে হয়েছিল। ইতিহাস সেই কথাই বলে। অস্ত্র ও শস্ত্র ছাড়া, নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ যুদ্ধশক্তি বিসর্জন দিয়ে শুধু শান্তির বাণী, মেধা ও শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে যেমন হিন্দু বাঙ্গালিও তিব্বতিদের বা পার্সিদের মতো উন্নাসিক হয়ে আছে নিজের ধর্ম বা নিজের ভূমি রক্ষার ক্ষেত্রে, তার মাশুল কিন্তু দিতেই হবে একদিন। বাঙ্গালি হিন্দু তার পূর্বপুরুষের দেশ অধুনা বাংলাদেশে নিজের ধন, মান, সম্পদ বিকিয়ে হারতে হারতে হা-ভাতে হয়ে এই দেশে পালিয়ে এসেও এখানে মার খেয়ে মরছে, অত্যাচারিত হচ্ছে কিন্তু ইতিহাসের চরম শিক্ষা নিচ্ছে না। তাই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালি আজ নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সংকটে রয়েছে এই ভারতভূমিতে স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও। স্বাধীনতা পরবর্তী হিন্দু বাঙ্গালির বুদ্ধি নিয়ে চললে ইহুদিদের অবস্থাও আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের মতো হয়ে যেত। ঠিক যেমনটি হয়েছে এখন তিব্বতিদের বা মঙ্গোলিয়ানদের বা কম্বোডিয়ার অধিবাসীদের। নিজভূমিতে থেকেও আজ তারা কমিউনিস্ট চীন দ্বারা পরাধীন।

হিন্দু বাঙ্গালি তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে কি ইতিহাসের সত্য ঘটনা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকট থেকে কি কিছু শিখবে? যদি শিক্ষা নিয়ে নিজের জাতির, নিজের সংস্কৃতির, নিজের ধর্মের রক্ষার জন্যে, নিজের স্বার্থে নিজের সঙ্ঘশক্তিকে মজবুত করতে এগিয়ে আসে তবেই হিন্দু বাঙ্গালি অস্মিতা রক্ষা পাবে। নয়তো আবার নিজ ভূমির ঘর বাড়ি ছেড়ে... পলায়ন। □

চমক জাগানো নোটবুক, ৪ হাজার ক্ষুদ্র গীতার স্রষ্টা অনন্যসাধারণ 'মাইক্রোম্যান'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ৫০ বছর ধরে এই বিন্দুতেই সিন্ধুকে ধরে আক্ষরিক অর্থে গীতার অনুলিখন করে চলেছেন ইছাপুরের মুকুল দে। আপন খেয়ালেই 'শ্রীমদ্ভগবত গীতা'র শ্লোক নিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গীতা তৈরির কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এই 'মাইক্রোম্যান'। তাঁর একমাত্র মেয়ে সঞ্চিতা সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন তার বই বাঁধাতে গিয়ে কোনো এক সময়ে সূক্ষ্মতার নেশাচ্ছন্ন হন তিনি। সঞ্চিতার ওয়ার্ক এডুকেশনের ডায়রি তৈরি করতে গিয়ে সেই নেশাতেই আচ্ছন্ন প্রৌঢ় এই বিশেষ ধরনের শিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। গীতাকে অণু, পরমাণু আকারে প্রকাশ করার নেশায় মেতে ওঠেন। শিল্পী এই নোটবুক দিয়েই তৈরি করেছেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, অ্যানাকোন্ডা, জুরাসিক পার্ক-সহ অন্যান্য জিনিস। মুকুল বাবুর স্পর্শে সহজে বোঝা যায় না শিল্প নিদর্শনগুলি শুধুমাত্র নোটবুক দিয়েই তৈরি।

১৯৯৩ সালে মুকুলবাবুর শিল্পকীর্তি প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। দেশি সর্ষে দানার মধ্যে ৬টি নোটবুক লাগান, প্রত্যেকটিতে ৪০টি করে পাতা রয়েছে। ২৪০ পাতা সমৃদ্ধ রেকর্ড করে আবার নিজেই সেই রেকর্ড ভেঙে সংখ্যাটা ৯৫-এ নিয়ে যান। ইছাপুর নবাবগঞ্জের কণ্ঠাধার এলাকায় যুগিপাড়ায় মুকুলবাবুর বাড়ি। তাঁর বাড়ির দরজায় নাম জ্বলজ্বল করছে। পুরানো তিনতলা বাড়িতে সপরিবারে তিনি থাকেন। তিনি ৩০ বছর বয়সে মেয়ের বই বাঁধাতে গিয়ে গীতার মাইক্রো সংস্করণ করার পরিকল্পনা করেন।

তিনি কর্মসূত্রে ইছাপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির টুল রুম ডিপার্টমেন্টের কর্মী ছিলেন। ২০০৫ সালে রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফ্যাক্টরির সহকর্মীরা তাঁকে উচ্চ পর্যায়ের কর্তাদের কাছে নিয়ে যান এবং তিনি প্রশংসিত হন। ১৯৯৪ সালের অসামান্য কীর্তির জন্য মুকুলবাবুর নাম লিপিবদ্ধ হয়। মুকুলবাবুর সংগ্রহে রয়েছে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় চার হাজার মাইক্রো গীতা। প্রতি গাতায় ১৮টি শ্লোক লেখা। উল্লেখ্য, জেনারেল নলেজ বইতে

মুকুলবাবুর কীর্তি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সারা বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়া বা গুগলে 'মাইক্রোম্যান' মুকুল বলে পরিচিত রয়েছেন। সেখানে তাঁর সব তথ্য জানা যাবে।

প্রথমদিকে আপন খেয়ালে নোটবুক তৈরি করতেন। পরিচিতদের কাছে প্রশংসা পেতেন। এরপর থেকেই নেশার মতো পেয়ে বসে এই নোটবুক তৈরির কাজ। ছোটো থেকে আরও ছোটো নোটবুক তৈরি করার কাজ এক মনে করতে থাকেন তিনি। ৯০ মিলিমিটার আয়তনের নোটবুক তৈরি দিয়ে শুরু।

মুকুলবাবুর তৈরি করা সব থেকে ছোটো নোটবুকটির আয়তন ০.৩ মিলিমিটার। সেই সময় শিল্পের সাধনায় খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দিল্লির প্রগতি ময়দান, দেরাদুন, কানপুর, মুম্বই, চেন্নাই, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি জায়গায় প্রদর্শনী দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। এখন মুকুলবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তিনি এখন দিল্লির নয়ডাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসালটেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বড়ো পদে চাকরি করছেন। বর্তমানে মুকুল বাবুর বয়স ৮০ বছর। চোখে দেখার ক্ষেত্রে সামান্য অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

বাংলায় প্রত্যেকটি অতি ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষর যা চোখের সামনে আতস কাঁচ নিয়ে তবেই পড়া যাবে। প্রতিটি বইয়ের পৃষ্ঠা ৯৫টি। প্রতিটি বই বাঁধানো। মুকুল দে তাঁর বানানো মাইক্রো গীতা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে উপহার দেন।

তিনি বলেন, যতদিন বাঁচবো মাইক্রো গীতা বানিয়ে যাবো। এটা আমার নেশা, আমার আর কোনো নেশা নেই। তাঁর স্ত্রী দীপা ও এক পুত্র হিমাদ্রি শেখর দে সবসময় তাঁকে উৎসাহ দেন। বাড়ির সকলে যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন তিনি দোতলার একটি ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বেলে আরও উন্নত শিল্প সাধনায় মগ্ন। মুকুলবাবুর এই কাজে সহযোগী থাকেন বন্ধু লক্ষ্মণ ঘোষ।

লক্ষ্মণ বাবু বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সকল শিল্পীদের বিভিন্ন ভূষণে সম্মানিত করছেন। মুকুলকে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় বঙ্গরত্ন, বঙ্গভূষণ বা পদ্মভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করা উচিত। কিন্তু সরকার শুধু তেলা মাথাতেই তৈল মর্দনের কাজ করে যায়। তারা এই শিল্পীর মহান ও কঠিন কর্মকাণ্ডকে মর্যাদা দিল না।

এই কারণে জীবনের শেষ প্রান্তে মুকুলবাবুর মনে প্রবল ক্ষোভ ও অভিমানের সঞ্চার হলেও কাজের নেশাতেই তিনি ভুলে থাকেন সরকারি অবহেলাকে। □

জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী

অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ২৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের তরফে তাঁকে মন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নিজের এক্স (ট্যুইটার) হ্যান্ডেলে সেই কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের আধিকারিকরা প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দিয়েছেন।

ট্রাস্টের তরফে জানানো হয়েছে, মোদীজীর হাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করানো হবে রামলালার। মোদীজী জানিয়েছেন, 'শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের তরফে তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য তাঁরা আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। গোটা জীবনের মধ্যে এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবো'। সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের গর্ভগৃহে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

সংবাদ সংস্থাকে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের জনৈক কর্তা জানিয়েছেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ২২ জানুয়ারি আমরা তাঁকে অযোধ্যায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ওই দিন অযোধ্যার রামমন্দিরে ভগবান শ্রীরামের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। আনন্দের বিষয়, মোদীজী সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ট্রাস্টের তরফে আরও জানানো হয়েছে, আগামী ২২ জানুয়ারি, ২০২৪ রামমন্দিরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরামলালার বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। এর আগে ২০২০ সালের ৫ আগস্ট মোদীজী অযোধ্যার রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির কাজ খতিয়ে দেখেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। মন্দিরের দরজা খুলে যাওয়ার সঙ্গে রাম মন্দির ঘিরে আবেগ গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। হিন্দুদের প্রতীক্ষার শেষ হবে ২২ জানুয়ারি।

কেরলের এর্নাকুলামে বিস্ফোরণ, মৃত ২, আহত ৪৫

গত ২৮ অক্টোবর হামাস নেতা খালেদ মাশাল কেরলের মালাপ্পুরমে প্যালেস্তাইনকে সমর্থন করে আয়োজিত একটি র‍্যালিতে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে বিষাক্ত, জেহাদী ভাষণ দেয়। তারপরের দিনই বিস্ফোরণ এর্নাকুলামের কনভেনশন সেন্টারে। ৬ বার বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে ঘটনাস্থল। বিস্ফোরণের ঘটনায় এক মহিলা সহ ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪৫। পর পর বিস্ফোরণে আইসিইউ-তে ভর্তি ১৮। অবস্থা আশঙ্কাজনক ৬ জনের। এদের প্রত্যেকেই আগুনে ঝলসে গিয়ে গুরুতর আহত। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী জেহোভা'স উইটনেসেস নামক একটি সম্প্রদায়ের মানুষদের তিন দিন ব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল ওই কনভেনশন সেন্টারে। শুক্রবার থেকে রবিবার, তিন দিন ধরে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলার কথা ছিল। কিন্তু তার মাঝেই গত ২৯ অক্টোবর, রবিবার সকাল ৯:৪০ মিনিটে জামরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনআইএ, এনএসজি। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতির বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। কেরলের ডিজিপি শেখ দারভেশ সাহেব জানিয়েছেন তদন্ত সবে শুরু হয়েছে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হবে বলে তিনি জানান। সূত্রের খবর প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, টিফিন বাক্সের ভেতরে আইইডি বিস্ফোরক রেখেই এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। হামলার দায় নিয়ে আত্মসমর্পণ নিজেকে জেহোভা'স উইটনেসেস অনুগামী বলে দাবি করা এক ব্যক্তির। দাবি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তথ্যভিজ্ঞ মহলের দাবি ওখানে ওই বিস্ফোরণ হামাসের সমর্থনে হওয়া জনসভা ও র‍্যালির সরাসরি প্রতিফলন। কেরালায় খ্রিস্টান প্রায় ৩০ শতাংশ।

সিপিএম-কংগ্রেস পুরোপুরি জেহাদি পিএফআই-এসডিপিআই এর কব্জায় থেকে হামাস-হেজবোল্লাকে সমর্থন করার দরুন কেরালার খ্রিস্টানরা ২০১৯ এর পর থেকে সিপিএম বা কংগ্রেসকে আর সমর্থন করছে না। খ্রিস্টানরা ইজরায়েলকে সহযোগিতা করার জন্য তাদের ওপর নেমে আসছে জেহাদি সন্ত্রাস। যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেছে সেটাও অতীব সন্দেহজনক।